সরকার (Government)

ইউনিট ৭

শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা রক্ষা এবং নাগরিকের নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক বিকাশ সাধনই হল রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য। রাষ্ট্র এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে সরকারের মাধ্যমে। রাষ্ট্র ও সমাজভেদে এ সরকার ব্যবস্থা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। কোন রাষ্ট্রে গণতন্ত্র থাকলে অন্য কোন রাষ্ট্রে হয়তো একনায়কতন্ত্র বা রাজতন্ত্র দেখা যায়। আবার শাসন ব্যবস্থায় প্রধান কর্তৃত্ব কার হাতে ন্যস্ত থাকবে তার উপরও সরকারের ধরণ নির্ভর করে। তবে জনগণের সর্বাধিক অংশগ্রহণে গঠিত সরকারই স্থায়ী ও সফল হয়ে থাকে। এই ইউনিটে সরকারের শ্রেণিবিভাগ, বিভিন্ন ধরণের সরকারের দোষ-গুণ এবং বিভিন্ন রকম সরকারের পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৭.১ঃ সরকারের ধারণা ও শ্রেণিবিভাগ	পাঠ-৭.৭ঃ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের গুণাবলি ও সমস্যা
পাঠ-৭.২ঃ গণতন্ত্রের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা	পাঠ-৭.৮ঃ সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের গুণাবলি ও সমস্যা
পাঠ-৭.৩ঃ একনায়কতন্ত্রের গুণাবলি ও সমস্যা	পাঠ-৭.৯ঃ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ও মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার
পাঠ-৭.৪ঃ গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র	পাঠ-৭.১০ঃ এককেন্দ্রিক সরকারের গুণাবলি ও সমস্যা
পাঠ-৭.৫ঃ গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তাবলি	পাঠ-৭.১১ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণাবলি ও সমস্যা
পাঠ-৭.৬ঃ আদর্শ শাসন ব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্র	পাঠ-৭.১২ঃ এককেন্দ্রিক সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

পাঠ-৭.১ সরকারের ধারণা ও শ্রেণি বিভাগ
(Concept and Classification of Goverment)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সরকারের ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- সরকারের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সরকার, এককেন্দ্রিক, যুক্তরাষ্ট্রীয়, স্বৈরতন্ত্র, রাজতন্ত্র, নগর রাষ্ট্র, পুলিশী রাষ্ট্র, জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র।

সরকারের ধারণা

যে চারটি উপাদান নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয় তার মধ্যে অন্যতম একটি উপাদান হল সরকার। সরকার ব্যতীত রাষ্ট্র পরিচালনা করা অসম্ভব। রাষ্ট্রের কর্মকান্ড সরকারের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। সরকার হল একটি বাস্তব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। একে রাষ্ট্রের মুখপাত্রও বলা হয়। বৃহৎ অর্থে সরকার গঠিত হয় সকল নাগরিকের সম্মতিক্রমে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচকমন্ডলী তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সরকার গঠন বা পরিবর্তন করে থাকে।

অধ্যাপক জে ডব্লিউ গার্নার বলেন, "সরকার হচ্ছে একটি কার্য-নির্বাহী মাধ্যম বা যন্ত্র যার মাধ্যমে সরকারের সাধারণ নীতিমালা নির্ধারিত হয় এবং যার দ্বারা সাধারণ বিষয়াদি নিয়ন্ত্রিত হয় ও সাধারণ স্বার্থ রক্ষিত হয়।"

অধ্যাপক আর জি গেটেল বলেন, "সরকার হচ্ছে রাষ্ট্রের একটি যন্ত্র বা সংস্থা।"

পরিশেষে বলা যায় যে, রাষ্ট্রের আইন-কানুন, রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত, বিধি-নিষেধ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা যে সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশিত ও বাস্তবায়িত হয় তাকে সরকার বলে। সরকারবিহীন রাষ্ট্র তার কর্মকান্ড পরিচালনা করতে সক্ষম হয় না।

সরকারের শ্রেণিবিভাগ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় সরকারের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কিত বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বহুকাল ধরে সরকারের শ্রেণিভাগের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হয়ে আসছে। অধ্যাপক অ্যালান বল (Alan Ball) তাঁর "Modern Politics and Government" গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চার সূচনা লগ্ন থেকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিবিভাগের একটি প্রচেষ্টা সবসময় লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত শ্রেণিবিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সরকারি কাঠামো ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পন্থা-পদ্ধতির মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিচার-বিশ্লেষণ করা যায় এবং এর ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের সমালোচনামূলক মূল্যায়ন করা যায়।

সরকারের শ্রেণিবিভাগঃ সনাতনী ধারণা

সরকারের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীনকাল থেকে সরকারের শ্রেণিবিভাগ মূলত তিনটি। প্রাচীনকালে যারা সরকারকে বিভিন্ন ভাগে বিশ্লেষণ করেছেন তাঁদের মধ্যে হিরোডোটাস (Herodotus) এবং এরিস্টটল (Aristotle) উল্লেখযোগ্য। হিরোডোটাস রাজতন্ত্র, কতিপয়তন্ত্র ও গণতন্ত্র এ তিন শ্রেণিতে সরকারকে বিভক্ত করেছেন। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরিস্টটল সরকারকে যে শ্রেণিতে বিভক্ত করেছিলেন সেটি বেশি প্রচলিত এবং সাড়া জাগানো।

এরিস্টটল এর সরকারের শ্রেণিবিভাগ

সরকারের শ্রেণি-বিভাজনকে কেন্দ্র করে প্রাচীন এবং আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটলের নাম এ ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। পন্ডিত এরিস্টটল তাঁর প্রখ্যাত 'পলিটিক্স' নামক গ্রন্থে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। কথিত আছে যে, তিনি সমকালীন ১৫৮টি নগর রাষ্ট্রের সংবিধান পর্যালোচনা করে এ শ্রেণিবিভাগ করেছেন।

এরিস্টটল দু'টি মূল সূত্র বা নীতির পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। সরকার ও শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে তিনি এ দুটি মূল সূত্র উপস্থাপন করেন–

(ক) উদ্দেশ্য নীতি (Principle of Purpose)

(খ) সংখ্যা নীতি (Principle of Number)

(ক) উদ্দেশ্য নীতি (Principle of Purpose) ঃ উদ্দেশ্য নীতির অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রক্ষমতা শাসক বা শাসক-শ্রেণির স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে নাকি জনসাধারণের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে এবং শাসক বা শাসকশ্রেণি কী উদ্দেশ্যে কাজ সম্পাদন করতে চায়। এরিস্টটল উদ্দেশ্য নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকটি সরকারকে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন।

(i) স্বাভাবিক সরকার (Normal Government) এবং

(ii) বিকৃত সরকার (Perverted Government)।

(i) স্বাভাবিক সরকার (Normal Government) ঃ যে শাসনব্যবস্থা জনকল্যাণে নিয়োজিত এবং জনকল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সে সরকারকে এরিস্টটল স্বাভাবিক শাসনব্যবস্থা বা সরকার বলেছেন। এখানে শাসক ব্যক্তি স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থে কাজ করেন। রাজতন্ত্র (Monarchy), অভিজাততন্ত্র (Aristocracy) এবং ন্যায়তন্ত্র (Polity) হচ্ছে স্বাভাবিক সরকার।

(ii) বিকৃত সরকার (Perverted Government) ঃ জনকল্যাণের পরিবর্তে যখন শাসক বা শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার জন্যই সরকার পরিচালিত হয়, এরিস্টটল তাকে বিকৃত শাসনব্যবস্থা বা সরকার নামে অভিহিত করেছেন। স্বৈরতন্ত্র (Tyranny), কতিপয়তন্ত্র (Oligarcly) এবং গণতন্ত্র হচ্ছে (Democracy) বিকৃত সরকার।

(খ) সংখ্যা নীতি (Principle of Number) ঃ সরকারের শ্রেণি বিভক্তিকরণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় নীতিটি হল সংখ্যা নীতি। সংখ্যা নীতি অনুসারে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা কতজন ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত আছে তার ভিত্তিতে সরকারের শ্রেণিবিভাগ করা হয়। সংখ্যা নীতির ভিত্তিতে এরিস্টটল তিন শ্রেণির সরকারের কথা বলেছেন।

(i) একজনের শাসন (Rule by one)

(ii) কয়েকজনের শাসন (Rule by few)

(iii) বহুজনের শাসন (Rule by many)।

(i) একজনের শাসন (Rule by one) ঃ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা একজনের হাতে ন্যস্ত থাকলে এবং জনকল্যাণসাধনই শাসনব্যবস্থা বা সরকারের উদ্দেশ্য হলে তাকে রাজতন্ত্র বলে। অর্থাৎ এক ব্যক্তির স্বাভাবিক শাসনই হল রাজতন্ত্র। কিন্তু এক ব্যক্তির দ্বারা শাসিত শাসন ক্ষমতা যদি কেবল শাসক বা রাজার স্বার্থেই ব্যবহৃত হয়, তবে তাকে স্বৈরতন্ত্র বলে। অতএব এক ব্যক্তি শাসিত রাষ্ট্রের বিকৃত শাসনকেই স্বৈরতন্ত্র বলা হয়।

(ii) কয়েকজনের শাসন (Rule by few) ঃ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা পরিচালনার দায়িত্ব একজনের পরিবর্তে কয়েকজন ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত থাকলে এবং তা জনসাধারণের মঙ্গল বিধানের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হলে তাকে অভিজাততন্ত্র বলে। অর্থাৎ মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির স্বাভাবিক শাসনই হল অভিজাততন্ত্র। কিন্তু এ শাসনব্যবস্থা শুধুমাত্র শাসকশ্রেণির মুষ্টিমেয় কয়েকজনের স্বার্থ সাধনে পরিচালিত হলে তা কতিপয়তন্ত্র (Oligarchy) হিসেবে গণ্য হয়। অর্থাৎ মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তির বিকৃত শাসনই হল কতিপয়তন্ত্র।

(iii) বহুজনের শাসন (Rule by many) ঃ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা বহুজনের হাতে ন্যস্ত থাকলে এবং সর্বসাধারণের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হলে, এরিস্টটলের মতে তা হল ন্যায়তন্ত্র। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকল নাগরিকের অংশগ্রহণ থাকলে ন্যায়তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এরিস্টটলের মতে এর বিকৃতিরূপ হচ্ছে গণতন্ত্র। গণতন্ত্রে ক্ষমতা বহুজনের হাতে ন্যস্ত থাকে। কিন্তু এ ব্যবস্থাতে ক্ষমতা সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার স্বার্থে পরিচালিত না হয়ে শুধুমাত্র শাসক সম্প্রদায়ের স্বার্থে পরিচালিত হয়।

পূর্বোক্ত দু'টি মূল নীতির ভিত্তিতে এরিস্টটল ছয় প্রকার শাসনব্যবস্থা বা সরকারের কথা বলেছেন।

এরিস্টটল প্রদত্ত সরকারের শ্রেণিবিভাগ

সংখ্যা নীতি	উদ্দেশ্য নীতি	
শাসকের সংখ্যা	স্বাভাবিক রূপ	বিকৃত রূপ
একজনের শাসন	রাজতন্ত্র	স্বৈরতন্ত্র
কয়েকজনের শাসন	অভিজাততন্ত্র	কতিপয়তন্ত্র
বহুজনের শাসন	ন্যায়তন্ত্র	গণতন্ত্র

এরিস্টটল এর সরকারের শ্রেণিবিভাগের সীমাবদ্ধতা

এরিস্টটলের শ্রেণিবিভাগ প্রাচীনকালে গ্রহণযোগ্যতা পেলেও আধুনিক কালে গ্রহণযোগ্য হয় না। মধ্যযুগের পর থেকে এ শ্রেণিবিভাগের বিরুদ্ধে নানা রকম বিরূপ সমালোচনা শুরু হয়। বিশেষ করে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য না করা, সংখ্যার ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ, গণতন্ত্র সম্পর্কে বিরূপ ধারণা, অবৈজ্ঞানিক ও অসম্পূর্ণ শ্রেণিবিভাগ বলে অনেক পন্ডিত মত পোষণ করেন।

সরকারের আধুনিক রূপ

এরিস্টটলের পরেও সরকারের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কিত আলোচনা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রোমের পলিবিয়াস (Polybius) ও সিসেরো (Cicero)-র নাম উল্লেখ করা যায়। এছাড়া এরিস্টটলের দৃষ্টিভঙ্গিকে মোটামুটি অনুসরণ করে যাঁরা বিভিন্ন সময়ে সরকারের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জ্যাঁ বোঁদা (Jean Bodin), চার্লস মন্টেস্কু (Charles Montesquieu), টমাস হবস (Thomas Hobbes), জন লক (John Locke), জন বার্জেস (John Burgess), জোহান ব্লুন্টসলি (Johan Bluntschlli) প্রমুখ।

ম্যারিয়ট এর সরকারের শ্রেণিবিভাগ

সরকারের আধুনিক শ্রেণিবিভাগ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যারিয়ট (John A. R. Marriott)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ম্যারিয়টের শ্রেণিবিভাগ আধুনিক ও বিস্তৃত। মূলত তিনটি ভিত্তিতে তিনি সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন।

১। ক্ষমতার আঞ্চলিক বণ্টনের বিচারে ম্যারিয়ট সরকারকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। এ দু'টি ভাগ হল ঃ এককেন্দ্রিক (Unitary) সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal) সরকার।

২। সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির বিচারে তিনি সরকারকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। এ দুটি ভাগ হল ঃ সুপরিবর্তীয় (Flexible) সরকার এবং দুষ্পরিবর্তনীয় (Rigid) সরকার।

৩। আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে তিনি তিন ধরনের সরকারের কথা বলেছেন ঃ স্বৈরতন্ত্র (Despotic), সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ পরিচালিত (Parliamentary or cabinet form) এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত (Presidential)। কোন শাসন ব্যবস্থাতে শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ নির্বাহীর নিয়ন্ত্রণহীন প্রাধান্য থাকলে তাকে স্বৈরতন্ত্র বলে। যে ব্যবস্থাতে আইন বিভাগের প্রাধান্য থাকে তাকে পার্লামেন্টারি বা সংসদীয় সরকার বলে। আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক সম্পূরক হলে তাকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলে।

তবে ম্যারিয়টের শ্রেণিবিভাগও পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না। এ শ্রেণিবিভাগও সম্পূর্ণ নয়। তিনি গণতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, রাজতন্ত্র প্রভৃতির কথা বলেননি।

লীকক্ এর সরকারের শ্রেণিবিভাগ

ম্যারিয়টকে অনুসরণ করে স্টিফেন লিকক (Stephen Leacock) সরকারের যে শ্রেণিবিভাগ করেছেন তা আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্বীকৃতি লাভ করেছে। তিনটি মূলনীতির ভিত্তিতে এ শ্রেণিবিভাগ করা হয়। এ তিনটি নীতি হল ঃ

১। সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহারকারী সংস্থা নির্ধারণ।

২। আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতি।

৩। শাসন ক্ষমতার আঞ্চলিক বণ্টন নীতি।

লীকক্ সরকারকে প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন, গণতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্র। গণতন্ত্রকে তিনি আবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ এ দু'শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। পরোক্ষ গণতন্ত্রকে আবার তিনি দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy) এবং প্রজাতন্ত্র (Republic)। ক্ষমতার বণ্টনের বিচারে এদের উভয়কে তিনি দু'ভাবে বিভক্ত করেছেন, এককেন্দ্রিক (Unitary) এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal)। আবার ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ভিত্তিতে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার উভয়ের দু'টি রূপের কথা বলেছেন ঃ পার্লামেন্ট বা মন্ত্রিপরিষদ পরিচালিত (Parliamentary or Cabinet) এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত (Presidential) সরকার।

লীককে অনুসরণ করে সরকারের শ্রেণিবিভাগ ব্যবস্থাটিকে নিম্নলিখিত ছকের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।

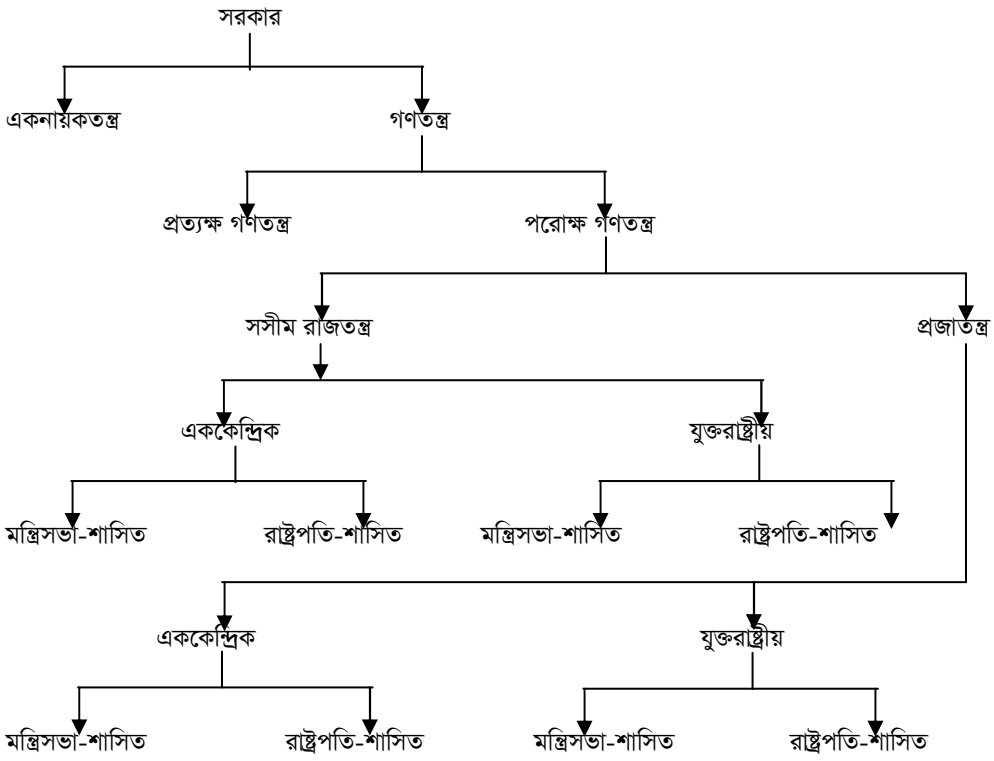

লীককের শ্রেণিবিভাজনকেও সর্বতোভাবে গ্রহণ করা যায় না। তিনি স্বৈরতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রকে সমার্থক গণ্য করেছেন। স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের উপ-বিভাগ সম্পর্কে কোন মতামত ব্যক্ত করেন নি। এ কারণেই লীককের শ্রেণিবিভাজনের কার্যকারিতা সম্পর্কে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ কিছুটা সংশয় প্রকাশ করেন।

আধুনিক সরকার

সরকারের শ্রেণিবিভাজনের আধুনিক কাঠামোটি আরো ব্যাপক। বিভিন্ন মতবাদের সারাংশ সংগ্রহ করে এ ধারণা গড়ে তোলা হয়েছে। শ্রেণিবিভাজনের এ প্রকল্প অনুযায়ী সরকারকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। যেমন ঃ স্বৈরতন্ত্র (Autocracy), একনায়কতন্ত্র (Dictatorship) এবং গণতন্ত্র (Democracy)। স্বৈরতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ রয়েছে– রাজতন্ত্র (Monarchy), সামরিকতন্ত্র (Military rule) এবং অভিজাত তন্ত্র (Aristocracy)। একনায়কতন্ত্র তিন ধরনের– ব্যক্তিগত (Personal), দলগত (Party Dictatorship) এবং শ্রেণিগত একনায়কতন্ত্র (Class Dictatorship)।

গণতন্ত্র একটি ব্যাপক ধারণা। নানাভাবে এবং নানাধরণে তার প্রকাশ ঘটে। গণতন্ত্রকে ব্যাপক অর্থে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা, সীমিত বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Limited or constitutional Monarchy) এবং প্রজাতন্ত্র (Republic)। এদের আবার ক্ষমতা বণ্টন অনুযায়ী এককেন্দ্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে ভাগ করা যায়। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুযায়ী এককেন্দ্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে মন্ত্রিসভা-চালিত এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে ভাগ করা যেতে পারে। সরকারের আধুনিক শ্রেণিবিভাগ নিম্নে একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে বণ্টন করা হল ঃ

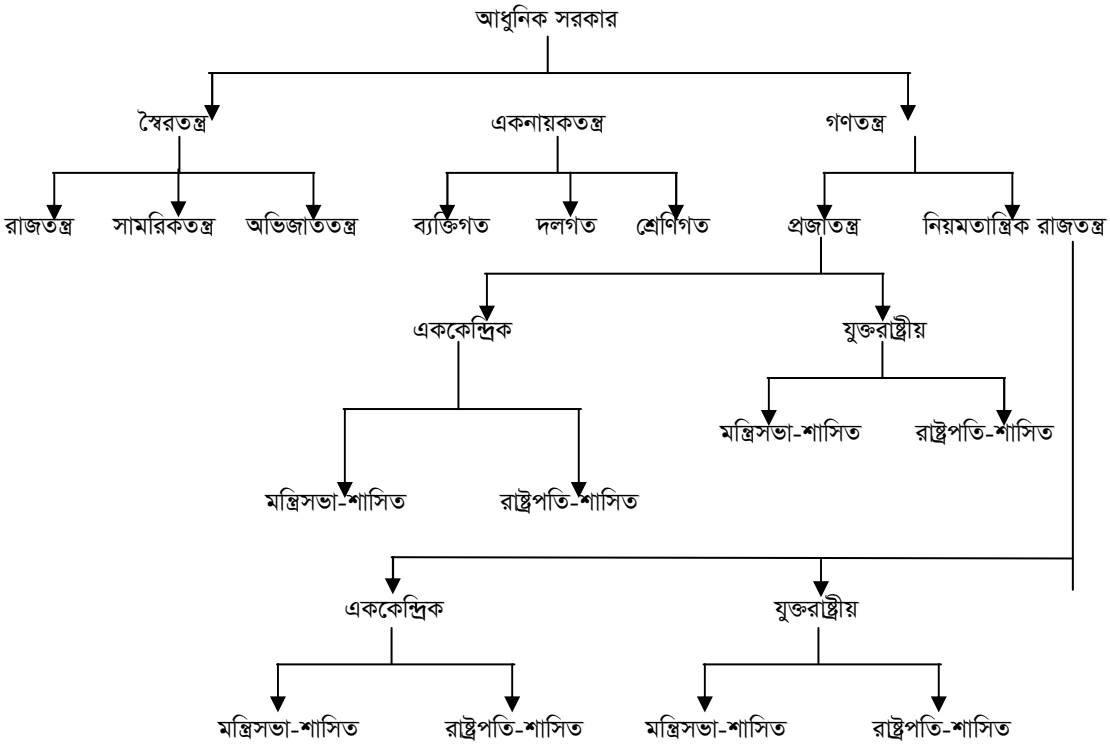

সরকারের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে পরবর্তীকালে নতুন উপাদান সংযোজিত হয়েছে। রাজনৈতিক আচরণবাদী এবং মার্কসবাদীগণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণিবিভাজনের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আচরণবাদীগণ সরকারের পরিবর্তে রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণের পক্ষে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	স্টিফেন লীকক প্রদত্ত সরকারের শ্রেণিবিভাগ দেখান।

সার-সংক্ষেপ

রাষ্ট্র একটি বিমূর্ত ধারণা। রাষ্ট্রের চারটি উপাদানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সরকার। সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতি ছাড়াও আরো কয়েকটি সরকার পদ্ধতি রয়েছে। এগুলোর মধ্যে একনায়কতন্ত্র, রাজতন্ত্র, এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। রাষ্ট্রের উপাদান কয়টি?

(ক) ২ (খ) ৩

(গ) ৪ (ঘ) ৫

২। 'সরকার হচ্ছে রাষ্ট্রের একটি যন্ত্র বা সংস্থা'– উক্তিটি কে করেছেন?
(ক) অধ্যাপক গার্নার (খ) অধ্যাপক গেটেল
(গ) অধ্যাপক লাস্কি (ঘ) অধ্যাপক উইলোবি

৩। 'The Politics' গ্রন্থের লেখক কে?
(ক) সক্রেটিস (খ) প্লেটো
(গ) এরিস্টটল (ঘ) আলেকজান্ডার

৪। 'The Republic' গ্রন্থের লেখক কে?
(ক) প্লেটো (খ) এরিস্টটল
(গ) লাস্কি (ঘ) গেটেল

৫। এরিস্টটল কয়টি দেশের সংবিধান পর্যালোচনা করে সরকারের শ্রেণি বিভাগ করেছেন?
(ক) ১৪৮ (খ) ১৫০
(গ) ১৫৪ (ঘ) ১৫৮

৬। এরিস্টটল কয়টি মূলনীতির পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন?
(ক) ২ (খ) ৪
(গ) ৬ (ঘ) ৮

৭। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যারিয়ট সরকারের কয়টি শ্রেণিবিভাগ করেছেন?
(ক) ২ (খ) ৩
(গ) ৪ (ঘ) ৫

৮। এরিস্টটলের মতে নিকৃষ্টতম সরকার কোনটি?
(ক) মধ্যতন্ত্র (খ) রাজতন্ত্র
(গ) গণতন্ত্র (ঘ) কতিপয়তন্ত্র

৯। লীকক্ সরকারকে কতটি ভাগে ভাগ করেছেন?
(ক) ২ (খ) ৪
(গ) ৬ (ঘ) ৮

পাঠ-৭.২ গণতন্ত্রের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা (Merits and Demerits of Democracy)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- গণতন্ত্রের সুবিধাগুলি সম্পর্কে বলতে করতে পারবেন।
- গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, সুশাসন, বিপ্লব, আইনের অনুশাসন, পুঁজিবাদ।

গণতন্ত্রের সুবিধাসমূহ

বর্তমান সময়ে গণতন্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত হয়। গণতন্ত্রের গুণ বা সপক্ষে সাধারণত নিম্নলিখিত যুক্তিগুলো প্রদর্শন করা হয় ঃ

১। **সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা ঃ** 'সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা' এই তিনটি আদর্শের ওপর ভিত্তি করে গণতন্ত্রের ইমারত দাঁড়িয়ে থাকে। গণতন্ত্রে সকলেই সমান, সমানাধিকার নীতিটি শুধু তত্ত্বগতভাবে নয়, বাস্তবেও গৃহীত হতে দেখা যায়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই আইনের চোখে সমান এবং সকলেই আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার সুযোগ পায়।

২। **দেশপ্রেম জাগরিত হয় ঃ** গণতন্ত্র জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করতে পারে। কারণ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেকেই অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সকলের স্বার্থ সমভাবে রক্ষিত হয়।

৩। **সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও সার্বিক কল্যাণ সাধন সম্ভব ঃ** জেরেমি বেন্থাম (Jeremy Bentham)-এর মতে শাসক ও শাসিতের স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সর্বাধিক জনগণের সর্বাধিক মঙ্গল সাধন করাটাই হল সুশাসনের প্রধান চ্যালেঞ্জ। শাসিতকে শাসকের পদে উন্নীত করা সম্ভব হলে এ সমস্যার সমাধান করা সহজ হয়। একমাত্র গণতন্ত্রেই শাসিত শাসকের পদে অধিষ্ঠিত হতে পারে এবং এর মাধ্যমে সর্বাধিক জনকল্যাণ সাধিত হতে পারে।

৪। **স্থায়িত্ব ঃ** অনেকের মতে, স্থায়িত্ব হল গণতন্ত্রের অন্যতম উল্লেখযোগ্য গুণ। জনগণের সম্মতির উপর এরূপ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত বলে সরকারের প্রতি জনগণ অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদর্শন করে।

৫। **সরকারের স্বৈরাচারিতা রোধ করে ঃ** গণতন্ত্র জনমত পরিচালিত শাসনব্যবস্থা বলে সরকার জনমতের ভয়ে সাধারণত স্বৈরাচারী হতে পারে না।

৬। **বিপ্লবের সম্ভাবনা কম ঃ** জনগণের হাতে সরকার পরিবর্তনের ক্ষমতা থাকায় জনগণের অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের আকার ধারণ করতে পারে না।

৭। **রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির সহায়ক ঃ** গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ধনী-দরিদ্র, অভিজাত-অভাজন, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক এবং সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

৮। **দায়িত্বশীলতা ঃ** গণতন্ত্রকে বলা হয় দায়িত্বশীল সরকার। শাসিতের সম্মতিতে যেহেতু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত এবং শাসনকার্য পরিচালিত হয় তাই গণতন্ত্র জনগণের নিকট দায়িত্বশীল থাকে। এখানে সরকার মন্ত্রিপরিষদ শাসিত কিংবা রাষ্ট্রপতি শাসিত হোক না কেন জনগণের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না।

৯। **আইনের শাসন ঃ** সুশাসনের অন্যতম উপদান হল আইনের শাসন (Rule of law)। আইনের শাসন নীতিটি হল জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের আইনের সমান অধিকার লাভ করা। আইনের শাসন যদি মেনে চলা না হয় তাহলে সে রাষ্ট্রের শান্তি-স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়ে যায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, গণতন্ত্রে সকল জনগণের অংশগ্রহণ থাকে বিধায় এ ব্যবস্থার অধীনে তাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত হয়। এখানে ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, গণতন্ত্রের মাধ্যমে মানুষ রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করে। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করে বিধায় নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বেশিরভাগ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গণতন্ত্রকেই সর্বোৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা মনে করেন।

গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পক্ষে নানা প্রকার যুক্তি-তর্কের অবতারণা করা হলেও বিরুদ্ধবাদিগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এর সমালোচনা করেন। নিম্নে গণতন্ত্রের কয়েকটি সীমাবদ্ধতা আলোচনা করা হল ঃ

১। **অদক্ষদের শাসন ঃ** গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়। কিন্তু অনেক দেশে জনগণের বিপুল অংশ নানাবিধ অজ্ঞতা, অজ্ঞানতা, কুসংস্কারগ্রস্ত থাকে। এ ধরনের জনসমাজের মধ্য থেকে উঠে আসা জনপ্রতিনিধিদের অনেকের মধ্যেও, এসব দুর্বলতা বিরাজ করে।

২। **স্থায়িত্বের অভাব ঃ** হেনরী মেইনের মতে, স্থায়িত্বের অভাব গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান ত্রুটি। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, জনগণ কর্তৃক পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় পরস্পর বিরোধী স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকার ফলে শাসনকার্য যথাযথভাবে পরিচালনা করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় না।

৩। **আমলাদের প্রাধান্য বৃদ্ধি ঃ** গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিবর্গ সরকার গঠন করলেও শাসনকার্য পরিচালনার জন্য যে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের সে জ্ঞান থাকে না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই আমলাদের ওপর তাঁদের অত্যধিক পরিমাণে নির্ভর করতে হয়। কিন্তু আমলাদের প্রাধান্য বৃদ্ধির অর্থই হল দীর্ঘসূত্রতা এবং জনস্বার্থ উপেক্ষিত হওয়া।

৪। **সৎ ও যোগ্য ব্যক্তির স্থান নেই ঃ** অনেকের মতে, গণতন্ত্রে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের স্থান নেই। এরূপ শাসনব্যবস্থায় দলীয় রাজনীতির প্রাধান্য থাকায় সৎ ও যোগ্য অথচ রাজনীতি-বিমুখ ব্যক্তিরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সম্মত হন না।

৫। **দলীয় শাসনের কুফল ঃ** দল প্রথা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের দ্বন্দ্ব অনেক সময় সংঘর্ষে রূপান্তরিত হয়ে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে।

৬। **পুঁজিবাদকে প্রশ্রয় দেয় ঃ** অনেকে গণতন্ত্রকে 'পুঁজিবাদীদের দুর্গ' বলে অভিহিত করেন। তাঁদের মতে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে গণতন্ত্র রাজনৈতিক এবং কিছু পরিমাণে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করলেও অর্থনৈতিক সাম্যের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে না।

৭। **সংখ্যালঘুর স্বার্থ উপেক্ষিত হয় ঃ** অনেকের মতে, গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন হওয়ার কারণে সংখ্যালঘিষ্ঠরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারে না। এভাবে তাদের স্বার্থ ক্রমাগত উপেক্ষিত হয়।

৮। **ব্যয়বহুল ঃ** অনেকে গণতন্ত্রকে ব্যয়বহুল শাসনব্যবস্থা বলে সমালোচনা করেন। জনমত গঠন, নির্বাচন অনুষ্ঠান, প্রচারকার্য প্রভৃতির পেছনে গণতন্ত্রে বিপুল পরিমাণ অর্থের অপচয় হয়।

৯। **জরুরি অবস্থার পক্ষে অনুপযোগী ঃ** গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রতিটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বলে বহি:শত্রুর আক্রমণ, কিংবা বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনায় জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে তা অনেক সময় অনুপযোগী বলে বিবেচিত হয়।

১০। **রক্ষণশীল শাসনব্যবস্থা ঃ** জনপ্রিয়তা ধরে রাখায় অনেক মনোযোগ দিতে হয় বিধায় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিরা গতানুগতিকতার উর্ধ্বে উঠতে পারে না।

১১। **দীর্ঘসূত্রিতা ঃ** অনেকে মনে করেন যে, গণতন্ত্রে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সরকার বিভিন্ন বিভাগের সাথে পরামর্শ করে থাকে। এ পরামর্শ বা মতামত থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে অনেক সময় ব্যয় হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যেসব যুক্তির অবতারণা করা হয় তাদের অনেকগুলো ভিত্তিহীন এবং কল্পনা-প্রসূত বলে মনে করা হয়। লর্ড ব্রাইসের মতে, গণতন্ত্র হয়তো বিশ্বমানবের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরিত করতে পারেনি, হয়তো শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত মনকে রাষ্ট্রের কার্যে নিয়োগ করতে সমর্থ হয়নি, হয়তো রাজনীতিকে ত্রুটি মুক্ত করতেও ব্যর্থ হয়েছে, তথাপি একথা সত্য যে, অন্যান্য শাসনব্যবস্থার তুলনায় আজকের গণতন্ত্র নিজেকে অনেকটাই সাধারন মানুষের মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতার একটি তালিকা তৈরি করুন।

সার-সংক্ষেপ

গণতন্ত্রকে অনেকে অক্ষম ও অশিক্ষিতের শাসন বলে থাকে। এ ধরনের শাসন ব্যবস্থায় দলীয় শাসন প্রতিফলিত হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে। তবে বর্তমান সময়ে গণতন্ত্রকে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা। গণতন্ত্রে জনগণের মতের প্রতিফলন হয়ে থাকে। গণতন্ত্রের মাধ্যমেই রাষ্ট্রে আইনের অনুশাসন, ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এর মাধ্যমে দেশপ্রেম জাগ্রত হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাংবিধানিক উপায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও জনগণের সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১। গণতান্ত্রিক শাসনে বিপ্লবের সম্ভাবনা কেমন?
- ক) কম
- খ) বেশি
- গ) একেবারেই নেই
- ঘ) কোনটিই নয়

২। গণতন্ত্র সরকারের স্বৈরাচারিতার সম্ভাবনা-
- ক) বাড়ায়
- খ) কমায়
- গ) সম্পূর্ণ দূর করে
- ঘ) কোনটিই নয়

৩। জরুরি অবস্থাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা-
- ক) সুবিধাজনক
- খ) অসুবিধাজনক
- গ) লাভজনক
- ঘ) কোনটিই নয়

৪। গণতন্ত্র পুঁজিবাদের-
- ক) সহায়ক
- খ) শত্রু
- গ) প্রতিবন্ধক
- ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ-৭.৩ একনায়কতন্ত্রের গুণাবলি ও সমস্যা (Merits and Demerits of Dictatorship)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- একনায়কতন্ত্রের গুণাবলি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- একনায়কতন্ত্রের কুফলগুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	একনায়কতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা, স্থিতিশীল সরকার, আমলাতন্ত্র, সামরিক শাসন।

একনায়কতন্ত্রের গুণাবলি

একনায়কতন্ত্রের সমর্থককেরা তাঁদের সমর্থিত শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ প্রমাণ করার জন্য নানা প্রকার যুক্তির অবতারণা করেন। একনায়কতন্ত্রের অন্যতম গুণ হল তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ। তবে আরো অন্যান্য যে গুণাবলি রয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

১। **সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা ঃ** একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রকৃতিগতভাবে সুদক্ষ হয়। কেননা, সুযোগ্য নায়কের একক নির্দেশে শাসন কার্যাদি পরিচালিত হয়। একনায়ক সুযোগ্য ও সুদক্ষ হওয়ার জন্য দেশের ভিন্নমুখী জটিল সমস্যাসমূহের দ্রুত সমাধান সম্ভব।

২। **স্থায়িত্ব ঃ** একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় দেশ শাসনের জন্য একনায়ক সুযোগ্য ব্যক্তিগণের উপর সরকারি কার্য পরিচালনার দায়িত্ব বন্টন করেন। ফলে সরকারি কাজে সাফল্য আসে। তাছাড়া একনায়কতন্ত্রে একটি দল থাকায় দল ত্যাগ, রাজনৈতিক দলাদলি, বিভিন্ন স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকে না। ফলে একনায়কতন্ত্র স্থায়িত্ব লাভ করে।

৩। **জাতীয়তাবাদ ঃ** একনায়কতন্ত্রের মূল কথা হল– এক জাতি, এক রাষ্ট্র এবং এক নায়ক। একনায়ক দেশের জনগণের মধ্যে জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের কথা প্রচার করে জাতীয় ঐক্যবোধ জাগরিত করেন। জনগণ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়। হিটলার জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্বের কথা প্রচার করে জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

৪। **জরুরি অবস্থার পক্ষে উপযোগী ঃ** যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ, গোলযোগ প্রভৃতি জরুরি অবস্থার মোকাবেলা করার জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেগুলো কার্যকরী করার ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। একনায়কতন্ত্রে একনায়কের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তাই জরুরি অবস্থার পক্ষে একনায়কতন্ত্র বিশেষ উপযোগী বলে মনে করা হয়।

৫। **দলীয় প্রভাব মুক্ত ঃ** একনায়কতন্ত্রে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকে। তাই এ শাসনব্যবস্থায় দলীয় কোন্দল, দলীয় সংঘর্ষ ও দলীয় প্রভাব মুক্ত থাকে। একনায়কতন্ত্রে দলীয় প্রভাব মুক্ত থাকে এবং দলীয় শাসনের কুফলগুলো প্রত্যক্ষ করা যায় না।

৬। **সাংস্কৃতিক বিষয়ের উন্নতি ঃ** অনেকের মতে, এরূপ শাসনব্যবস্থায় একনায়কের ইচ্ছাই চূড়ান্ত বলে তিনি যদি শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির অনুরাগী হন তাহলে ঐসব ক্ষেত্রে প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হতে পারে।

৭। **যোগ্য ও মেধাবীদের নিয়োগ ঃ** নিয়োগের ক্ষেত্রে একনায়কের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এখানে নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয় চাপ, প্রভাব বা সুপারিশ না থাকায় একনায়ক প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে মেধাবী, যোগ্য ও অভিজ্ঞ লোকদের নিয়োগ দিতে পারেন। ফলে প্রশাসকবৃন্দ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে।

৮। **ব্যয় সংকোচন ঃ** একনায়কতন্ত্রে একনায়ক দীর্ঘদিন যাবৎ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। এর মাঝে কোন নির্বাচন বা উপনির্বাচনের প্রয়োজন হয় না। আর নির্বাচনের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয়ও হয় না। গণতন্ত্রসহ অন্যান্য সরকার ব্যবস্থায় প্রচুর অর্থ শুধু নির্বাচনের পিছনেই ব্যয় হয়ে থাকে।

৯। **আমলাদের দৌরাত্ম্য হ্রাস ঃ** একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এক নায়ক চাইলে যোগ্য ও মেধাবীদের প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দিতে পারেন। তারা কাজে অভিজ্ঞ ও দক্ষ। এছাড়া এ শাসনব্যবস্থায় একনায়ক নিজেও অনেক সময় প্রশাসনিক ব্যাপারে অভিজ্ঞ থাকে। তাকে আমলাদের উপর নির্ভরশীল হতে হয় না। যার ফলে আমলাদের দৌরাত্ম ও প্রভাব হ্রাস পায়।

১০। **স্থিতিশীল সরকার ঃ** একনায়কতান্ত্রিক সরকার জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত নয় যে জনগণের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হবে। জনগণ ইচ্ছা করলেই এ সরকারকে পরিবর্তন করতে পারে না। দীর্ঘদিন যাবত এ সরকার স্থিতিশীলভাবে সরকার পরিচালনা করে থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, একনায়কতন্ত্রে একনায়ক যে কোন বিষয়ে একক ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। একনায়ক দীর্ঘদিন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন বিধায় তিনি অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করেন। একনায়ক দলীয় প্রভাব মুক্ত থেকে দেশকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে শাসন করতে পারেন।

একনায়কতন্ত্রের সমস্যা

একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর মতামতের কোন স্থান নেই এবং এখানে জনমত কোন প্রভাব বিস্তার করে না। একনায়কতন্ত্রের সমর্থক ও সুবিধাভোগীরা এই ব্যবস্থার নানাবিধ গুণ চিহ্নিত করলেও, বস্তুত এটি একটি সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংসকারী ব্যবস্থা। নিম্নে একনায়কতন্ত্রের দোষাবলীর আলোচনা করা হল ঃ

১। **ব্যক্তিস্বাধীনতা পরিপন্থী ঃ** এরূপ শাসনব্যবস্থায় জনগণের স্বাধীনতার কোন মূল্য নেই। এখানে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটে না। আত্মসম্মান ও আত্মপ্রত্যয়বোধ জাগ্রত হয় না।

২। **বাহুবলের উপর নির্ভরশীল ঃ** একনায়কতন্ত্রের ভিত্তি হল বাহুবল। শক্তির জোরে, বল প্রয়োগের দ্বারা নায়ক তাঁর শাসনকে স্থায়িত্ব দেয়ার চেষ্টা করেন। বিরোধীদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য নির্বাসন, কারাদন্ড, এমনকি গুপ্তহত্যার আশ্রয় নিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন না।

৩। **বিশ্ব শান্তির পরিপন্থী ঃ** একনায়কতন্ত্রের অন্যতম তত্ত্ব হল পৃথিবীতে বাঁচার অধিকার কেবল শক্তিমানেরই আছে। মুসোলিনীর মতে, আন্তর্জাতিক শান্তি হল কাপুরুষের স্বপ্ন; সাম্রাজ্যবাদ হল জীবনের শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয় নিয়ম।

৪। **বিপ্লবের আশংকা ঃ** এরূপ শাসনব্যবস্থায় জনমতের কোন মূল্য থাকে না। শাসিতের সম্মতির উপর শাসকের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ একদিন বিপ্লবের আকার ধারণ করে এরূপ শাসনব্যবস্থার ধ্বংস সাধন করে।

৫। **সাম্য বিরোধী ঃ** একনায়কতন্ত্র সাম্য ও সমানাধিকারের নীতিতে আস্থাশীল নয়। তাই এরূপ শাসনব্যবস্থা মুষ্টিমেয় ব্যক্তি দেশ শাসন করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে বিনা প্রতিবাদে তাদের সেই স্বৈরাচারী জনস্বার্থ বিরোধী শাসন অবনত মস্তকে মেনে নিতে হয়।

৬। **রাজনৈতিক চেতনা অবরুদ্ধ ঃ** এরূপ শাসনব্যবস্থায় একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকায় জনগণ অন্য কোন দলের প্রতি তাদের সমর্থন জানানোর সুযোগ পায় না। ফলে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে না। সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক চেতনা হয়ে পড়ে অবরুদ্ধ।

৭। **উপেক্ষিত সাধারণ জনগোষ্ঠী ঃ** একনায়কতন্ত্রের রাষ্ট্রই প্রধান; মানুষের কোন মূল্য নেই। একনায়কতন্ত্র প্রচার করে যে, জন্ম থেকেই ব্যক্তি রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত। সাধারণ জনগোষ্ঠীকে উপেক্ষিত করে বোঝানো হয় যে রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি; ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্র নয়।

৮। **স্বায়ত্তশাসন অস্বীকৃত ঃ** একনায়কতন্ত্র মানুষের স্বায়ত্তশাসনকে উপেক্ষা করে বলে তা কখনই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। একনায়কতন্ত্র যতই সুশাসন ব্যবস্থা হোক না কেন, তা কখনই স্বায়ত্তশাসনের বিকল্প হতে পারে না।

৯। **অস্থায়ী শাসনব্যবস্থা ঃ** একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় একনায়কের হাতে সর্বময় ক্ষমতা থাকে। রাষ্ট্র পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব তিনিই পালন করেন। এ শাসন ব্যবস্থায় মাত্র একজন ব্যক্তির হাতে সর্বময় ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। ফলে তার মৃত্যুর সাথে সাথে এ শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটে। এজন্য এই শাসনব্যবস্থাকে অস্থায়ী শাসনব্যবস্থা বলা হয়ে থাকে।

১০। **দুর্নীতির প্রসার ঃ** একনায়কতন্ত্রে সীমাহীন দুর্নীতির জন্ম হয়। কারও নিকট জবাবদিহি করতে হয় না বলে একনায়ক চরম দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পড়ে। লর্ড এ্যাকটন বলেন, æPower tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely".

পরিশেষে বলা যায় যে, একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণের স্বাধীনতা অবরুদ্ধ থাকে। তাদের মতামতের কোন মূল্য নেই, এখানে ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব হয়। একনায়কের মুখাপেক্ষী হয়ে সাধারণ জনগোষ্ঠীর জীবন পরিচালিত হয়। একনায়কের আদেশই আইন; আইনের অনুশাসন এখানে অনুপস্থিত।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা জনগণ কেন মেনে নেয় না?

সার-সংক্ষেপ

একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের বিপরীত শাসন ব্যবস্থা। একজন ব্যক্তি যখন দেশের যাবতীয় শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করে অপ্রতিহতভাবে প্রয়োগ করে তখনই সেই শাসন ব্যবস্থাকে একনায়কতন্ত্র বলে। সাধারণত কোন ব্যক্তি বা সমরনায়ক জনগণের নামে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বলপূর্বক ক্ষমতা অধিকার করেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাদের শাসন জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বিধায়, সমস্ত বিরোধী মতামতকে শক্তি বা বল প্রয়োগের দ্বারা দমন করতে একনায়ক দ্বিধা করেন না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। হিটলার কোন দেশের একনায়ক ছিলেন?
(ক) স্পেন (খ) জার্মানী
(গ) ইংল্যান্ড (ঘ) ইতালী

২। "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely"–কে বলেছেন?
(ক) ফোর্ড (খ) ব্যানারম্যান
(গ) ফাইনার (ঘ) লর্ড অ্যাকটন

৩। ইতালিতে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন কে?
(ক) ফ্রাঙ্কো (খ) হিটলার
(গ) গাদ্দাফি (ঘ) মুসোলিনী

৪। সর্বাত্মকবাদের প্রশ্রয় দেওয়া হয় কোথায়?
(ক) একনায়কতন্ত্র (খ) গণতন্ত্র
(গ) রাজতন্ত্র (ঘ) সমাজতন্ত্র

পাঠ-৭.৪ গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র (Democracy and Dictatorship)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের পার্থক্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ব্যক্তি স্বাধীনতা, বিশ্ব শান্তি, উগ্রজাতীয়তাবাদ, স্বায়ত্তশাসন, সর্বাত্মকবাদ, বিপ্লব, সাম্য, গুপ্তহত্যা।

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র দুটি পরস্পর-বিরোধী রাজনৈতিক আদর্শ। স্বাভাবিকভাবেই গণতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মধ্যে সর্বক্ষেত্রেই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পার্থক্যগুলোকে বৈশিষ্ট্য ও গুণগত দিক থেকে নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

১। **শাসনের ক্ষেত্রে ঃ** গণতন্ত্র হল জনগণের শাসন এবং একনায়কতন্ত্র এক ব্যক্তি বা দলের শাসন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে জনমতের কোন মূল্য নেই। একনায়কতন্ত্রে জনগণ শাসনকার্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না। এখানে একজন মাত্র শাসকের অপ্রতিহত প্রাধান্য সর্বত্রই বিদ্যমান থাকে।

২। **দলীয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ঃ** গণতন্ত্রে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে কিন্তু একনায়কতন্ত্রে একটি দল থাকে। গণতন্ত্রে একাধিক রাজনৈতিক দল অপরিহার্য। কিন্তু একনায়কতন্ত্রের একনায়কের দল ছাড়া অন্য সব দলের অস্তিত্ব বলপূর্বক বিলুপ্ত করা হয়।

৩। **ব্যক্তিস্বাধীনতার ক্ষেত্রে ঃ** গণতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতার অনুপন্থী, অপরদিকে একনায়কতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী। জনগণের রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার স্বীকৃতি গণতন্ত্রের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে মানুষের সকল প্রকার স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা হয়। মানুষের কোন মতামতের মূল্য দেওয়া হয় না।

৪। **গণসম্মতির ক্ষেত্রে ঃ** গণতন্ত্র জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা। জনগণ ইচ্ছা করলেই সরকারের পরিবর্তন করতে পারে। কিন্তু একনায়কতন্ত্র জনসম্মতির পরিবর্তে পেশি শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এক ব্যবস্থা।

৫। **স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে ঃ** গণতন্ত্র দলীয় শাসনব্যবস্থা বলে পরস্পর বিরোধী স্বার্থের সংঘাত, দল ত্যাগ প্রভৃতির ফলে বার বার সরকারের পরিবর্তন হয়। স্থায়িত্বের অভাব গণতন্ত্রের অন্যতম ত্রুটি। কিন্তু একনায়কতন্ত্র একদলীয় শাসন বলে দল ত্যাগ, রাজনৈতিক দলাদলি, দলভিত্তিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রভৃতি এখানে থাকে না।

৬। **বিশ্ব শান্তির ক্ষেত্রে ঃ** গণতন্ত্র বিশ্ব শান্তিতে বিশ্বাসী। সর্বপ্রকার বলপ্রয়োগ গণতন্ত্রের নীতি বিরুদ্ধ। কিন্তু একনায়কতন্ত্র উগ্র-জাতীয়তাবাদ প্রচারের মাধ্যমে বিশ্বে অশান্তি আহ্বান করে। মুসোলিনী বলতেন, "স্ত্রীলোকের নিকট মাতৃত্ব যেমন কাম্য, পুরুষের নিকট যুদ্ধও তেমনি কাম্য।"

৭। **জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে ঃ** গণতন্ত্রে আলাপ-আলোচনা, ভোটাভুটি প্রভৃতির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বলে যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ, আভ্যন্তরীণ গোলযোগ প্রভৃতি জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে এরূপ শাসনব্যবস্থা অনুপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে নায়কের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং সেখানে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় না বলে এরূপ শাসনব্যবস্থা জরুরি অবস্থার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

৮। **সাম্য ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ঃ** গণতন্ত্র, সাম্য, সমানাধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার নীতিসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। এরূপ শাসনব্যবস্থায় ধর্ম, বর্ণ, জাতি, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সমান। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে এসব গণতান্ত্রিক নীতি সম্পূর্ণভাবেই উপেক্ষিত হয়।

৯। **স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে ঃ** গণতন্ত্র জনগণের স্বায়ত্তশাসন স্বীকৃত; কিন্তু একনায়কতন্ত্রে জনগণের এ অধিকার সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত। তাই বলা হয়, একনায়কতন্ত্র যতই সুশাসন হোক না কেন, তা কখনই স্বায়ত্তশাসনের বিকল্প বলে বিবেচিত হতে পারে না।

১০। **বিপ্লবের সম্ভাবনা ঃ** গণতন্ত্রে জনগণ ব্যালটের সাহায্যে শান্তিপূর্ণভাবে সহজেই সরকারের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। তাই এরূপ শাসনব্যবস্থা অনেকাংশে বিপ্লবের সম্ভাবনা মুক্ত বলা যেতে পারে। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ ভাবে সরকারের পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাই জনগণের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ একদিন বিপ্লবের আকার ধারণ করে এরূপ শাসনব্যবস্থার ধ্বংস সাধন করে।

১১। **দলীয় শাসনের ক্ষেত্রে ঃ** গণতন্ত্র দলীয় শাসন বলে এরূপ শাসনব্যবস্থায় দলীয় সংঘর্ষ, ভোট ক্রয়-বিক্রয়, নির্বাচনে অর্থের অপচয় প্রভৃতি দলীয় শাসনের কুফলগুলো দেখা যায়। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকায় এরূপ শাসনব্যবস্থায় দলীয় শাসনের কুফল প্রত্যক্ষ করা যায় না।

পরিশেষে বলা যায় যে, একনায়কতন্ত্রের চেয়ে গণতন্ত্র উত্তম শাসন ব্যবস্থা। বর্তমান বিশ্বে বেশির ভাগ রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উপর বেশি আস্থাশীল। গণতন্ত্রের যে দোষ-ত্রুটি রয়েছে সেগুলো সমাধান করা সম্ভব। পক্ষান্তরে, একনায়কের পতন ছাড়া একনায়কতন্ত্রের দোষ-ত্রুটি সমাধান সম্ভব নয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের পার্থক্য নিরূপণ করুন।

সার-সংক্ষেপ

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সকল শ্রেণির মানুষ সরকারের অংশ হতে পারে। তত্ত্বগতভাবে এ ব্যবস্থাতে সকল শ্রেণির মানুষের মতামত প্রতিফলিত হয় এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। এছাড়া নিয়মিত সুষ্ঠু নির্বাচন ও রাজনৈতিক কার্যাবলিতে সকলের অংশগ্রহণের অধিকার গণতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তি-স্বাধীনতার ভিত্তিতে গড়ে উঠা শাসনব্যবস্থাই গণতন্ত্র। অন্যদিকে, একনায়কতন্ত্র হল গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী শাসনব্যবস্থা। একনায়কতন্ত্র বলতে এমন শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা কোন একজন ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১। ব্যক্তি স্বাধীনতা কোথায় অস্বীকৃত?
(ক) গণতন্ত্রে (খ) একনায়কতন্ত্রে
(গ) সমাজতন্ত্রে (ঘ) রাজতন্ত্রে

২। "স্ত্রীলোকের কাছে মাতৃত্ব যেমন কাম্য, পুরুষের নিকট যুদ্ধও তেমনি কাম্য"– কে বলেছেন?
(ক) ফ্রাঙ্কে (খ) হিটলার
(গ) মুসোলিনী (ঘ) গাদ্দাফি

৩। জনগণের শাসন স্বীকৃত কোথায়?
(ক) গণতন্ত্র (খ) একনায়কতন্ত্র
(গ) রাজতন্ত্র (ঘ) কোনটিই নয়

৪। গণতন্ত্রের বিপরীত শাসনব্যবস্থা কী?
(ক) রাজতন্ত্র (খ) একনায়কতন্ত্র
(গ) অভিজাততন্ত্র (ঘ) মধ্যতন্ত্র

পাঠ-৭.৫ গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তাবলি
(Conditions for the Success of Democracy)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তাবলি আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	গণতান্ত্রিক জনগণ, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য, গণতন্ত্রের স্বরূপ, অর্থনৈতিক সাম্য, জাতীয় ঐকমত্য, জবাবদিহিতা, জনমত, গণমাধ্যম।

গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তাবলি

বর্তমানকালে আদর্শগতভাবে গণতন্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচিত। এ শাসন ব্যবস্থা কার্যকর ও টেকসই করা কষ্টকর। হেনরী মেইন (Henry Maine) এ প্রসঙ্গে বলেন, "সকল ধরনের সরকারের মধ্যে গণতন্ত্র সবচেয়ে কঠিন"। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা নানা ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। জন স্টুয়ার্ট মিল গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য তিনটি শর্তের উল্লেখ করেন। শর্তগুলো হল এরূপ ঃ

(ক) গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করার ইচ্ছা ও সামর্থ্য জনগণের থাকা প্রয়োজন।
(খ) ব্যক্তিগত অধিকার সংরক্ষেণের জন্য জনগণকে সদাসতর্ক থাকতে হবে।
(গ) নিজ নিজ নাগরিক কর্তব্য পালন এবং অধিকার রক্ষার সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছা ও সামর্থ্য জনগণের থাকতে হবে।

গণতন্ত্রের সাফল্যের অন্যান্য কতগুলো আবশ্যকীয় শর্তাবলি নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

১। **গণতান্ত্রিক জনগণ ঃ** মিলের অভিমত ব্যাখ্যা করলে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, 'গণতান্ত্রিক জনগণের' ওপর গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। বস্তুত জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা ও ভাবধারা যতই বিস্তার লাভ করবে, গণতন্ত্র ততই সাফল্যের পথে এগিয়ে যাবে।

২। **গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ঃ** গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ছাড়া কোন শাসন ব্যবস্থাতেই গণতন্ত্রের সাফল্য আসতে পারে না। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চালু না থাকলে দেশের মানুষ গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ও সুফল যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারে না।

৩। **সৎ, সুদক্ষ ও কর্তব্যপরায়ণ আমলাতন্ত্র ঃ** শাসনকার্য সুদক্ষভাবে পরিচালনার জন্য যে শিক্ষা এবং বিশেষীকৃত জ্ঞানের প্রয়োজন গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধিদের অনেকের তা থাকে না। তাই শাসনকার্য পরিচালনার জন্য আমলাতন্ত্রের উপর তাঁদের বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয়। আমলারা সৎ, সুদক্ষ, কর্তব্যপরায়ণ এবং জনকল্যাণকামী মনোভাবাপন্ন না হলে গণতন্ত্র তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে না।

৪। **সহিষ্ণুতা ঃ** গণতন্ত্রে সকলেই যাতে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ মতাদর্শ প্রচার করতে পারে, ইচ্ছানুযায়ী যেকোন আদর্শকে সমর্থন করতে পারে, সেজন্য অনুকূল পরিবেশের প্রয়োজন। এই পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন আত্মসংযম এবং সহিষ্ণুতার। গণতন্ত্রে সরকার ও বিরোধী পক্ষকে সহিষ্ণু হতে হয়।

৫। **গণতান্ত্রিক শিক্ষার প্রসার ঃ** গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সুনাগরিকের প্রয়োজন। কিন্তু সুনাগরিকতার প্রধান প্রতিবন্ধকতা হল নির্লিপ্ততা, ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণ দলীয় মনোভাব। এসব প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন প্রকৃত গণতান্ত্রিক শিক্ষা।

৬। **রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার ঃ** গণতন্ত্রকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য নাগরিকদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারসমূহের শুধু তত্ত্বগত স্বীকৃতিই যথেষ্ট নয়, সেগুলোকে বাস্তবে কার্যকরি করা প্রয়োজন।

৭। **ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ঃ** ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণকে অনেকে গণতন্ত্রের সাফল্যের অন্যতম শর্ত বলে মনে করেন। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হলে জনগণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। ফলে তাদের রাজনৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষমতা সম্পর্কে অংশীদারিত্বের বোধ জন্ম নেয়।

৮। **সুযোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ঃ** জোসেফ শ্যুমপিটার (Joseph Schumpeter)-এর মতে গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন ন্যায়পরায়ণ, যুক্তিবাদী এবং বিবেকবান নেতৃত্ব। মনের সংকীর্ণতা দূর করে জনগণকে সুস্থ পথে পরিচালিত করার জন্য সৎ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রয়োজন।

৯। **আইনের শাসন ঃ** গণতন্ত্রের সাফল্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত আইনের শাসন। এর অর্থ আইনের চোখে সবাই সমান। আইনের আশ্রয় লাভ করার অধিকার সকল নাগরিকের। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল নাগরিক আইনের সমান সুযোগ বা অধিকার লাভ করবে। আইনের শাসনের অনুপস্থিতি নির্বাচনভিত্তিক গণতন্ত্রকে অর্থহীন করে দেয়।

১০। **জবাবদিহিতা ঃ** সুশাসন কিংবা গণতন্ত্রকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্বের জবাবদিহিতার সংস্কৃতি চালু থাকা আবশ্যক। রাজনৈতিক নেতৃত্বের জবাবদিহিতা থাকলে প্রশাসনসহ রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা চালু হয় যা একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ।

১১। **দল ব্যবস্থা ঃ** রাজনৈতিক দলব্যবস্থা ছাড়া গণতন্ত্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। রাজনৈতিক দল জনমত গঠনের মাধ্যমে রাজনৈতিক চর্চা করে থাকে। সুসংহত ও সক্রিয় রাজনৈতিক দল না থাকলে একনায়কতন্ত্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

১২। **স্বাধীন ও নিরপেক্ষ গণমাধ্যম ঃ** একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণমাধ্যমকে স্বাধীনতা দিতে হয় এবং গণমাধ্যম যাতে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে তার সুযোগ সৃষ্টি করতে হয়। প্রচার মাধ্যমগুলোর উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ গণতন্ত্রকে বাধাগ্রস্ত করে। তাই স্বাধীন গণমাধ্যম গণতন্ত্রের সাফল্যের অন্যতম শর্ত।

পরিশেষে বলা যায় যে, কোন একক শর্ত পালনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের সাফল্য আশা করা যায় না। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ছাড়া গণতন্ত্র স্থায়ী হতে পারে না। বস্তুত: জনগণ ও শাসনকারী গোষ্ঠীর মধ্যে যে কোন একদিকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অনুপস্থিতি থাকলে টেকসই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শর্তগুলো কি কি?

সার-সংক্ষেপ

বর্তমান সময়ে গণতন্ত্র হল সবচেয়ে জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা। অন্য যে কোন শাসন পদ্ধতি অপেক্ষা গণতন্ত্রের জনপ্রিয়তা অনেক বেশি। অনেকের মতে আদর্শগত বিচারেও গণতন্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার সফলতার জন্য বহু পূর্বশর্ত রয়েছে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আকস্মিকভাবে অর্জন করা যায় না। এর জন্য দরকার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন জনগণ, গণতান্ত্রিক শিক্ষার প্রসার, জাতীয় ঐক্যমত, আইনের শাসন ও দায়বদ্ধ সরকার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা কোনটি?
(ক) একনায়কতন্ত্র (খ) গণতন্ত্র
(গ) রাজতন্ত্র (ঘ) প্রজাতন্ত্র

২। "সকল ধরণের সরকারের মধ্যে গণতন্ত্র সবচেয়ে কঠিন"– কে বলেছেন?
(ক) হেনরী মেইন (খ) জন স্টুয়ার্ট মিল
(গ) আর জি গেটেল (ঘ) ল্যারি ডায়মন্ড

৩। জন স্টুয়ার্ট মিল গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য কয়টি শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন?
(ক) ২ (খ) ৩
(গ) ৪ (ঘ) ৫

৪। গণতন্ত্রের জন্য কোনটি বেশি প্রয়োজন?
(ক) আমলাতন্ত্র (খ) ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ
(গ) সামরিক শাসন (ঘ) মৌলবাদ

পাঠ-৭.৬ আদর্শ শাসন ব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্র (Democracy as an Ideal Type of Government)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আদর্শ শাসন ব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্র এর স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মৌলিক অধিকার, আইনের অনুশাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, জনগণের শাসন, রাজনৈতিক শিক্ষা, গণমাধ্যম।

আদর্শ শাসন ব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্র

প্রাচীনকাল থেকেই রাষ্ট্র পরিচালনায় বিভিন্ন ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত রয়েছে। নানা ধরনের শাসন ব্যবস্থার মধ্যে গণতন্ত্র অন্যতম। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের পর থেকে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সারা বিশ্বে অন্যান্য শাসন ব্যবস্থা থেকে বেশি জনপ্রিয়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা হচ্ছে জনগণের সম্মতিভিত্তিক জনকল্যাণমুখী একটি শাসন ব্যবস্থা। আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূল চালিকা শক্তিই হচ্ছে গণতন্ত্র। নিম্নে আদর্শ শাসন ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রের স্বরূপ উল্লেখ করা হল ঃ

১। **সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রতিষ্ঠিত ঃ** গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে যে রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে তারাই গণতন্ত্রে সরকার গঠন করে। নির্বাচকমন্ডলী ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে।

২। **মৌলিক অধিকার স্বীকৃত ঃ** গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত ও সংরক্ষিত। জনগণ যদি মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে রাষ্ট্র আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৩। **আইনের শাসন ঃ** আইনের শাসন বলতে আইনের প্রাধান্যকে বোঝায়। অর্থাৎ আইন সকলের জন্য সমান। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র জনগণের আইনের অধিকার নিশ্চিত করে। রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিনষ্ট হয় জনগণের নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হয়। সবচেয়ে বড় কথা, আইনের শাসনের অভাবে মানুষ ন্যায়বিচার বঞ্চিত হয়।

৪। **স্বচ্ছতা ঃ** গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সরকারের কার্যক্রম সম্পর্কে স্বচ্ছতা বিরাজ করে। স্বচ্ছতা বলতে বুঝায়, সরকার যা করছে জনগণ তা জানতে পারে। রাষ্ট্র কর্তৃক যে সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড করা হয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে সকল চুক্তি সম্পাদন করা হয়, সে সকল বিষয় সম্পর্কে জনগণের কাছে স্বচ্ছতা থাকা দরকার; যেটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সম্ভব।

৫। **জবাবদিহিতা ঃ** গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাদের কর্মকান্ডের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহি করে থাকেন। রাজনৈতিক নেতৃত্বের জবাবদিহিতার সংস্কৃতির ধারাবাহিকতাতে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্রসহ অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে জবাবদিহিতা চালু থাকে।

৬। **নির্বাচন ব্যবস্থা ঃ** গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান দিক হল নির্বাচন ব্যবস্থা। এখানে নির্বাচনের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে। নির্বাচনে পরাজিত পক্ষ বিরোধী দল হিসেবে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করে। শক্তিশালী বিরোধী দল থাকলে সরকার স্বৈরচারী হতে পারে না।

৭। **গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ঃ** জনমত প্রকাশের প্রধান বাহন হচ্ছে গণমাধ্যম। গণমাধ্যম স্বাধীন না হলে সরকারের ভালো-মন্দ দু'টি দিক জনগণ জানতে পারবে না। জনগণের বিভিন্ন চাহিদা ও অভিযোগ গণমাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে।

৮। **জনগণের শাসন ঃ** গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে জনগণের শাসন বলে অভিহিত করা হয়। এ ধরনের শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের মতামত শাসন ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শাসনকার্য পরিচালনা করে বিধায় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে জনগণের শাসন বলা হয়।

৯। **সক্রিয় অংশগ্রহণ ঃ** গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের যেমন অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে, তেমনি প্রত্যেক নাগরিকেরও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। এই সুযোগ অন্য কোন ধরনের ব্যবস্থাতে অবারিত থাকে না।

১০। **সাংবিধানিক প্রাধান্য ঃ** সংবিধানের প্রাধ্যান্য বলতে বুঝায় সংবিধানের উর্ধ্বে আর কোন আইন নেই। সংবিধানকে অমান্য করার এখতিয়ার সরকারের নেই। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সংবিধানের প্রাধান্যকে স্বীকার করা হয়। এর ফলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের স্বেচ্ছাচারী হবার সুযোগ সীমিত।

১১। **রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঃ** গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঘটে। এখানে সরকারি দল ও বিরোধী দল রাজনীতি সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপন করে। আইন সভার বির্তক, জনসভা, মিছিল-স্লোগান, টেলিভিশন টকশোসহ নানাবিধ মাধ্যমে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঘটে।

১২। **ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি ঃ** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ। এ ধরনের রাষ্ট্রে গণবিপ্লব বা অভ্যুত্থানের সুযোগ নেই। সরকারের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেলে নির্বাচনের সময় তারা জনগণের ভোট কম পাবে। গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয় সরকার গঠনের জন্য।

সবশেষে বলা যায়, আইনের শাসন, ব্যক্তিস্বাধীনতা, শাসন ক্ষমতায় অংশগ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত থাকার কারণে, অনেকেই রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র বা মৌলবাদী শাসনব্যবস্থার তুলনায় গণতন্ত্রকে অনেক উন্নতর মতাদর্শ হিসাবে চিহ্নিত করে থাকেন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	গণতন্ত্রকে এখন পর্যন্ত সর্বোত্তম শাসন ব্যবস্থা বলা হয় কেন? মূল্যায়ন করুন।

সার-সংক্ষেপ

সরকার পরিচালনার বহু পদ্ধতি রয়েছে। তবে সকল পদ্ধতি অপেক্ষা গণতন্ত্রকে বলা হয় আদর্শ শাসন ব্যবস্থা। গণতন্ত্রপন্থীদের মতে গণতন্ত্রে জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন হয়ে থাকে। কেননা গনতন্ত্রে জনগণের মতামতের উপর ভিত্তি করে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। জনগণের মৌলিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায়। জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গণতন্ত্রকে আদর্শ শাসন ব্যবস্থা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থায়?
(ক) একনায়কতন্ত্রে (খ) গণতন্ত্রে
(গ) রাজতন্ত্রে (ঘ) প্রজাতন্ত্রে

২। জনমত প্রকাশের বাহন কী?
(ক) নির্বাচন (খ) সমাবেশ
(গ) গণমাধ্যম (ঘ) সব কয়টি

৩। আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূল চালিকা শক্তি—
(ক) গণতন্ত্র (খ) রাজতন্ত্র
(গ) সমাজতন্ত্র (ঘ) প্রজাতন্ত্র

৪। জনগণ সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থায়?
(ক) রাজতন্ত্র (খ) সমাজতন্ত্র
(গ) গণতন্ত্র (ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ-৭.৭ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের গুণাবলি ও সমস্যা (Merits and Demerits of the Presidential Form of Government)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের গুণাবলি আলোচনা করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের সমস্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	জনকল্যাণ, নির্বাচকমন্ডলী, জরুরি অবস্থা, বিচার বিভাগের প্রাধান্য, ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের গুণাবলি

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের কতকগুলো বিশেষ গুণ রয়েছে নিম্নে তা আলোচনা করা হল ঃ

১। **স্থায়িত্ব ঃ** সরকারের স্থায়িত্ব রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গুণ হিসেবে বিবেচিত হয়। আইনসভার আস্থা-অনাস্থার উপর সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল নয়। নির্দিষ্ট কার্যকাল অতিক্রান্ত হওয়ার আগে সরকারের পতন ঘটার আশঙ্কা থাকে না।

২। **জনকল্যাণ ঃ** আইনসভার সদস্যদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সময়ের অপব্যয় ঘটে না। সরকার জনকল্যাণে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে। সরকারের অনুসৃত নীতি ও কার্যক্রমের মধ্যে নিরবিচ্ছিন্নতা বজায় থাকে। এর ফলে সরকারের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়।

৩। **জরুরি অবস্থার উপযোগী ঃ** রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় উপযোগী। শাসন-বিভাগের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকে বিধায়, জরুরি প্রয়োজনে তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারেন।

৪। **ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের সুবিধা ঃ** ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির প্রয়োগের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। এ ধরণের শাসনব্যবস্থায় আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ পরস্পর স্বতন্ত্র থেকে নিজ-নিজ এলাকায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এর ফলে আইন এবং শাসন বিভাগের মধ্যে সংঘর্ষের আশঙ্কা থাকে না।

৫। **রাষ্ট্রপতির স্বাধীনতা ঃ** এই ধরনের সরকারে সরকারি নীতি নির্ধারণ, সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং এ সমস্ত নীতি ও সিদ্ধান্তকে বাস্তবে রূপায়িত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি স্বাধীনভাবে ভূমিকা পালন করে থাকেন। তাঁর উপর দলীয় প্রভাব বা প্রাধান্য বিস্তার করা সহজে সম্ভব হয় না।

৬। **রাষ্ট্রের উন্নয়ন সাধন ঃ** রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে উন্নয়ন প্রক্রিয়া দ্রুত থাকে। রাষ্ট্রপতি তাঁর কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়বদ্ধ থাকেন না বিধায়, তিনি এককভাবে দ্রুত ও কার্যকরী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। একই সুযোগে আইন সভার সময়ক্ষেপণ বাদ দিয়ে তিনি দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনাও করতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে প্রধান নির্বাহী হিসাবে রাষ্ট্রপতি দলতন্ত্রের মধ্যে আটকে না থেকেই বেশির ভাগ সময় প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তগুলি নিতে পারেন। এ কারণে কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পক্ষে মত দেন।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের সমস্যাবলী

বিভিন্ন গুণাবলির অস্তিত্ব সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনার অভাব নেই। নিম্নে তা আলোচনা করা হল ঃ

১। **ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির কুফল ঃ** ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের কুফল রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। আইন-বিভাগ এবং শাসন বিভাগ পরস্পর পৃথক থেকে নিজ-নিজ কার্য সম্পাদন করে। তাই এ দুই বিভাগের মধ্যে সহযোগিতার অভাব ঘটে। এতে উভয় বিভাগের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ও সংঘর্ষের আশংকা থাকে।

২। **স্বৈরাচারমূলক ঃ** এই প্রকার শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগের সকল ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে রাষ্ট্রপতির হাতেই ন্যস্ত থাকে। রাষ্ট্রপতি আইনসভার সদস্য নন। আবার আইনসভার কাছে তিনি দায়বদ্ধও নন। নির্দিষ্ট কার্যকাল অতিক্রান্ত হওয়ার আগে তাঁকে সহজে পদচ্যুত করা যায় না। এর ফলে রাষ্ট্রপতির পক্ষে স্বেচ্ছাচারী হওয়ার পথে কোন বাধা থাকে না।

৩। **অনমনীয়তা ঃ** শাসনব্যবস্থার অনমনীয়তা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের অন্যতম ত্রুটি হিসেবে গণ্য হয়। রাষ্ট্রপতিই মূলত ক্ষমতার মূল স্তম্ভ বিধায়, তাঁর ইচ্ছার বাইরে রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থায় কোন ধরনের কাম্য পরিবর্তন সহজে সম্পাদন করা সম্ভব হয় না।

৪। **জনমত প্রতিফলিত হয় না ঃ** রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে জনসাধারণের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয় না। কারণ সে রকম কোন সুযোগ এ ধরনের সরকারে থাকে না। গণসংযোগের মাধ্যমগুলোর সাহায্যে এই সংযোগ পরোক্ষভাবে সম্পাদিত হয়। এ কারণে রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থায় জনমতের প্রকৃত প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় না।

পরিশেষে বলা যায় যে, নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকলেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা চালু আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে এই ব্যবস্থা বেশ সাফল্যের সঙ্গে বহাল আছে। মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দল প্রথার উদ্ভব ও বিকাশ, আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতার ভিত্তি প্রস্তুত করেছে। তার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার সফল হয়েছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের কয়েকটি সমস্যা চিহ্নিত করুন।

সার-সংক্ষেপ

গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার একটি রূপ হল রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা। এ ধরনের শাসন ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে না। রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁর নির্বাহী কর্তৃত্বের সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটান। রাষ্ট্রপতির কার্যকাল সংবিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট থাকে। সংবিধান লংঙ্ঘন, দেশ দ্রোহিতা, উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি কারণে তাঁকে পদচ্যুত করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থাতে শাসন বিভাগের প্রধান কে?
(ক) রাষ্ট্রপতি (খ) প্রধানমন্ত্রী
(গ) স্পীকার (ঘ) কোনটিই নয়

২। রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থাতে আইনসভার নিকট দায়-দায়িত্ব নেই কার?
(ক) প্রধানমন্ত্রী (খ) রাষ্ট্রপতি
(গ) মন্ত্রসভা (ঘ) স্পীকার

৩। রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থাতে সবচেয়ে ক্ষমতাবান কে?
(ক) সেনাপ্রধান (খ) রাষ্ট্রপতি
(গ) মন্ত্রিসভা (ঘ) স্পীকার

পাঠ-৭.৮ সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের গুণাবলি ও সমস্যা (Merits and Demerits of Parliamentary Form of Government)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের গুণাবলি আলোচনা করতে পারবেন।
- সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের সমস্যাগুলি চিহ্নিত করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	জনমতের প্রাধান্য, জনকল্যাণকামী, নাগরিক সচেতনতা, জাতীয় সংকট, রাজনৈতিক শিক্ষা।

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের গুণাবলি

বর্তমানকালে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই গণতন্ত্রকে স্বাগত জানানো হয়েছে। আর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পার্লামেন্টারি বা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়, উভয় ব্যবস্থাতেই সংসদীয় শাসন সমানভাবে জনপ্রিয়। সংসদীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করলে এর ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণগুলো অনুধাবন করা যায়। নিম্নে এ ধরনের কয়েকটি কারণ আলোচনা করা হল ঃ

১। **আইন ও শাসন বিভাগের মধ্যে সুসম্পর্ক ঃ** সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক এবং গভীর বোঝাপড়া থাকে। এরকম শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতিকে স্বীকার করা হয় না। উভয় বিভাগের মধ্যে এই পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সুশাসনের পথ প্রশস্ত হয়।

২। **গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় থাকে ঃ** এই শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভাই হল প্রকৃত শাসক। এই মন্ত্রিসভা আবার জনগণের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। ফলে জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারাই সরকারি নীতি নির্ধারিত হয় এবং শাসনকার্য পরিচালিত হয়। এতে গণতান্ত্রিক শাসন বা জনগণের শাসনের স্বরূপ বজায় থাকে।

৩। **সরকার স্বৈরাচারী নয় ঃ** সংসদীয় সরকারে মন্ত্রিসভাকে সরকারি নীতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে সকল বিষয়ে আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকতে হয়। আইনসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। তাই মন্ত্রিসভা স্বৈরাচারী হতে পারে না। এছাড়া, মন্ত্রিসভার জনস্বার্থ বিরোধী এবং স্বৈরাচারী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিরোধী দল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

৪। **নমনীয় ও পরিবর্তনশীল ঃ** সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা বিশেষভাবে নমনীয়। এরূপ শাসন ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে প্রয়োজনমাফিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। প্রয়োজনের তাগিদে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রিপরিষদে পরিবর্তন আনয়নে অসুবিধা হয় না।

৫। **রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঃ** এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঘটে। সরকারি নীতি, দেশের বিভিন্ন সমস্যা ও সরকারি কার্যক্রম নিয়ে পার্লামেন্টে আলোচনা ও সমালোচনা হয়। তার মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষ সরকারের কার্যকলাপ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে।

৬। **সুশাসন প্রতিষ্ঠা ঃ** গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে যেকোন বিষয়ে স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় এবং সঠিকভাবে উচিৎ-অনুচিৎ স্থির করা যায়। এ ধরনের অনুশীলন সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

৭। **রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সমন্বয় ঃ** সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় রাজতন্ত্রকে বজায় রেখেও গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পাওয়া যায়। রাজা বা রাণীকে নিয়মতান্ত্রিক শাসকের পদ দিয়ে মন্ত্রিসভাকে প্রকৃত শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। উদাহরণ হিসেবে ব্রিটেনের সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার কথা বলা যেতে পারে।

৮। **জনমতের প্রাধান্য ঃ** মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে জনমতের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। জনগণের মতামত উপেক্ষা করে সরকার এককভাবে কোন সিদ্ধান্ত নিলে জনগণ তা মেনে নেয় না। জনগণের ভোটে নির্বাচিত বিধায় আইন সভার

সদস্যদের জনমতের ব্যাপারে সর্তক থাকতে হয়। এখানে জনমতের উপর ভিত্তি করেই সরকার আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ করে থাকে।

৯। **বিরোধী দলের মর্যাদা ঃ** মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে বিরোধী দলের মর্যাদা রয়েছে। এখানে বিরোধী দল সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করে থাকে। সরকারের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়া এবং বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপনের মাধ্যমে বিরোধী দল গণতন্ত্র চর্চায় অবদান রাখতে পারে।

১০। **জনকল্যাণকামী ঃ** জনকল্যাণ সাধন মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের অন্যতম গুণ। সরকার যদি জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন করার চেষ্টা না করে, তাহলে পরবর্তী নির্বাচনে জনগণ সরকারি দলকে ভোট দান থেকে বিরত থাকে। এ আশংকা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সরকারি দল জনকল্যাণকামী হয়ে থাকে। ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়ার আকাঙ্খা থাকে বিধায় বিরোধী দলও জনকল্যাণমুখী অবস্থান গ্রহণ করে।

১১। **জাতীয় সংকট নিরসন ঃ** মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বিভিন্ন জাতীয় সংকট দক্ষতার সাথে সমাধান করতে পারে। সংকটকালীন সময়ে প্রয়োজনে বিরোধী দলের সাথে সরকারি দল পরামর্শ করে সিদ্ধান্তে আসতে পারে।

নানাবিধ ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক বিবেচনা করে বলা যায় যে, মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসন ব্যবস্থা অপরাপর শাসন ব্যবস্থা থেকে অধিকতর উত্তম শাসন ব্যবস্থা। এ শাসন ব্যবস্থা জনগণের মতামতের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সরকার তাদের কাজের জন্য আইনসভা ও জনগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকে। অন্য কোন শাসনব্যবস্থায় জনগণের নিকট শাসনকারী কর্তৃপক্ষের এতটা দায়বদ্ধতা দেখা যায় না।

সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের সমস্যাবলী

উপরোক্ত গুণাবলির অস্তিত্ব সত্ত্বেও সংসদীয় শাসনব্যবস্থা বিরূপ সমালোচনার হাত এড়াতে পারেনি। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এরূপ সরকারের বিরুদ্ধে বহুবিধ ত্রুটির কথা বলা হয়। নিম্নে তা আলোচনা করা হল ঃ

১। **সুশাসনের অন্তরায় ঃ** সংসদীয় ব্যবস্থাতে মন্ত্রীগণকে শাসনকার্য ছাড়াও আইন প্রণয়ন কাজে অংশগ্রহণ করতে হয় এবং প্রশ্নোত্তর দানে ব্যস্ত থাকতে হয়। তাছাড়া মন্ত্রীদের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয়। এর ফলেও মন্ত্রীদের অনেকটা সময় চলে যায়। এতে বিভাগীয় মন্ত্রীগণ তাঁদের উৎসাহ-উদ্দীপনার পুরোটাই নির্বাহী ক্ষেত্রে নিয়োগ করতে পারেন না। এটি সুশাসনের অন্তরায় হিসেবে বিবেচিত হয়।

২। **অখন্ড সরকারি নীতি অনুসৃত হয় না ঃ** সংসদীয় সরকারের পরিবর্তনশীলতা বা নমনীয়তা অন্যতম গুণ হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু এটি সরকারি নীতি ও কার্যক্রমের অখন্ডতার বিরোধী। এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় ঘন-ঘন মন্ত্রিসভায় পরিবর্তনের আশংকা থাকে। আবার মন্ত্রিসভায় পরিবর্তন হলে সরকারি নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম দেখা দেয়।

৩। **জরুরি অবস্থার উপযোগী নয় ঃ** এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় সরকারি সকল সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত হয়। সেজন্য কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না।

৪। **দল ব্যবস্থার ত্রুটি ঃ** সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব অপরিহার্য বিবেচিত হয়। ফলে এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় দল ব্যবস্থার সকল ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। সংকীর্ণ দলাদলি, দলীয় স্বার্থ, যোগ্যতার উপেক্ষা প্রভৃতি শাসনব্যবস্থার দক্ষতার হানি ঘটায়।

৫। **নয়া স্বৈরাচার ঃ** সংসদীয় ব্যবস্থাতে কোন একটি দল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সরকার গঠন করলে একদলীয় শাসনের আশঙ্কা তৈরি হয়। মন্ত্রিসভার স্বৈরাচারের পথে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ক্ষমতা দুর্বল বিরোধী দলের থাকে না।

৬। **ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুপস্থিত:** সংসদীয় ব্যবস্থাতে আইন ও শাসন বিভাগের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না। অর্থাৎ আইন সভাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতেই নির্বাহী বিভাগের দায়িত্ব থাকে। সরকারের এই দুই বিভাগের একীভূত হয়ে থাকাকে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর মনে করেন।

৭। **পক্ষপাতমূলক প্রশাসন ঃ** মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসনব্যবস্থা যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয় সেহেতু প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দলীয় প্রভাব থাকে। আর এ পক্ষপাতমূলক প্রশাসন জনগণের জন্য অকল্যাণকর।

পরিশেষে বলা যায় যে, মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের কিছু ত্রুটি থাকলেও বর্তমান বিশ্বে এ শাসনব্যবস্থা ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়। অনেকে মনে করেন, ক্ষমতাসীন দল যদি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অনুসরণ করে তাহলে সংসদীয় ব্যবস্থাতেই গণতন্ত্রের সবচেয়ে বেশি সুফল পাওয়া সম্ভব।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের সুবিধাগুলো কি কি?

সার-সংক্ষেপ

যে শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা শাসন ক্ষমতার অধিকারী এবং মন্ত্রিপরিষদ তাঁদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বা সংসদীয় সরকার বলে। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসন ব্যবস্থায় সরকারের সকল ক্ষমতা তত্ত্বগতভাবে একজন রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকে। কিন্তু প্রকৃত শাসন ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের উপর ন্যস্ত থাকে। বর্তমানে মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার জনপ্রিয় ও নন্দিত সরকারে পরিণত হচ্ছে। তবে এ সরকারের কিছু ত্রুটি দূর করে আরো বেশি জনপ্রিয় ও অর্থবহ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মন্ত্রণালয়ের প্রধান কে?
(ক) সচিব (খ) উপসচিব
(গ) মন্ত্রী (ঘ) স্পীকার

২। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে মূল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু কে?
(ক) রাষ্ট্রপতি (খ) প্রধানমন্ত্রী
(গ) সেনাপ্রধান (ঘ) প্রধান বিচারপতি

৩। কোনটি মন্ত্রীপরিষদ শাসিত ব্যবস্থাতে দেখা যায় না?
ক) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ (খ) আমলাতন্ত্র
(গ) দুর্নীতি (ঘ) স্বজনপ্রীতি

পাঠ-৭.৯ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ও মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার
(Presidential and Parliamentary Form of Government)

উদ্দেশ্য
এই পাঠ শেষে আপনি–

- রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ও মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	নামসর্বস্ব শাসক, আইনসভার সার্বভৌমত্ব, সংবিধানের প্রাধান্য, জরুরি অবস্থা, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ও মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতির আলোকে বা শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি অনুসারে আধুনিক গণতান্ত্রিক সরকারসমূহকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা– সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার। এই উভয় ধরনের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যগুলো দেখা যায়।

১। **রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতার ক্ষেত্রে পার্থক্য ঃ** সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক বা নামসর্বস্ব শাসক এবং প্রকৃত শাসক এই দু'ধরনের শাসক দেখা যায়। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থার নিয়মতান্ত্রিক বা নামসর্বস্ব কোন শাসক প্রধানের পদ থাকে না। রাষ্ট্রপতিই একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান এবং শাসন বিভাগের প্রধান কর্তা। তিনি তত্ত্বগতভাবে এবং বাস্তবে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী।

২। **দায়িত্বের ক্ষেত্রে ঃ** সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় প্রকৃত প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ হল মন্ত্রিসভা। মন্ত্রিসভার সকল সদস্য প্রত্যক্ষভাবে আইনসভার কাছে এবং পরোক্ষভাবে জনসাধারণের কাছে দায়িত্বশীল থাকে। অপরপক্ষে, রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষভাবে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হন। তিনি জনগণের কাছেই দায়িত্বশীল থাকেন।

৩। **মন্ত্রিসভার ক্ষেত্রে ঃ** সংসদীয় আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। অপরপক্ষে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থায় একটি মন্ত্রিসভা থাকে। রাষ্ট্রপতিই এই মন্ত্রিসভার সদস্যদের মনোনীত ও নিযুক্ত করেন। মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতির কাছে দায়িত্বশীল। রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির উপর তাদের কার্যকাল নির্ভরশীল।

৪। **জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে ঃ** রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার স্বার্থে অনেক সময় আইনীভাবেই একক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থায় জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থার মত দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না।

৫। **নমনীয়তা ঃ** সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও সংবিধান নমনীয়। প্রয়োজনমাফিক আইনগত কিংবা সাংবিধানিক পরিবর্তন এ ব্যবস্থাতে তুলনামূলক সহজ। পক্ষান্তরে, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের সংবিধান কিংবা সরকার পরিবর্তন করতে হলে এক বিশেষ জটিল পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়।

৬। **আইনসভার সার্বভৌমত্ব ঃ** সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের আইনসভা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। আইনসভা অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে সরকারকে অপসারণ করতে পারে। অন্যদিকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় আইনসভা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী নয়।

৭। **নির্বাচনগত পার্থক্য ঃ** রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী প্রথমে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। নির্বাচনে জয়ের পরে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন।

৮। **আইনসভা ভেঙ্গে দেবার ক্ষেত্রে ঃ** সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে প্রধানমন্ত্রী আইনসভা ভেঙ্গে দেবার জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান করতে পারেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিতে পারেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিতে পারেন না।

সবশেষে বলা যায়, মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার উভয়ই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার দুটি রূপ। উভয় সরকার ব্যবস্থারই কিছু দোষ-ত্রুটি রয়েছে। বস্তুত: কোন ধরনের ব্যবস্থা অধিক কার্যকর হবে তা নির্ভর করে একটি দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপরে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	রাষ্ট্রপতি শাসিত ও মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের মাঝে মূল পার্থক্যগুলো তুলে ধরুন।

সার-সংক্ষেপ

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের শ্রেণিবিভাগে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতি মূলত দুটি পৃথক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত সরকার ব্যবস্থা। উভয় ব্যবস্থারই কিছু ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক রয়েছে। তবে আইনসভা ও শাসন বিভাগের মধ্যে নিবিড় সহযোগিতা থাকলে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারই বেশি উপযোগী। আবার শাসন ব্যবস্থার দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার দিক বিবেচনা করলে রাষ্ট্রতি শাসিত সরকারই বেশি কাম্য বলে মনে করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সংসদীয় ব্যবস্থাতে শাসন বিভাগের প্রধান কে?
(ক) প্রধানমন্ত্রী (খ) রাষ্ট্রপতি
(গ) স্পীকার (ঘ) প্রধান বিচারপতি

২। জরুরি অবস্থায় কোন সরকার ব্যবস্থা উপযোগী?
(ক) রাষ্ট্রপতি শাসিত (খ) মন্ত্রিপরিষদ শাসিত
(গ) একনায়কতন্ত্র (ঘ) রাজতন্ত্র

৩। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় আইনসভা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন কে?
(ক) স্পীকার (খ) বিরোধী দল
(গ) প্রধানমন্ত্রী (ঘ) নির্বাচন কমিশন

৪। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকারকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
(ক) ২ (খ) ৪
(গ) ৬ (ঘ) ৮

পাঠ-৭.১০ এককেন্দ্রিক সরকারের গুনাবলি ও সমস্যা
(Merits and Demerits of Unitary Governemt)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- এককেন্দ্রিক সরকারে গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- এককেন্দ্রিক সরকারের সীমাবদ্ধতাগুলি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ক্ষমতার প্রাধান্য, আইনসভার প্রাধান্য, অর্থনৈতিক বিকাশ, সুষম উন্নয়ন, স্বায়ত্তশাসন, স্বৈরাচার, রাজনৈতিক চেতনা।

এককেন্দ্রিক সরকারের গুণাবলি

এককেন্দ্রিক সরকারের গঠন ও কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কতকগুলো গুণ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে এককেন্দ্রিক সরকারের গুণাবলি আলোচনা করা হল ঃ

১। **কেন্দ্রীয় ক্ষমতার প্রাধান্য ঃ** এককেন্দ্রিক সরকারের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় অত্যন্ত সহজ এবং সুষ্ঠুভাবে তার পক্ষে কার্য-পরিচালনা করা সম্ভব। প্রশাসন পরিচালনায় কোন জটিলতা সৃষ্টি হয় না।

২। **শক্তিশালী সরকার ঃ** এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে সরকার শক্তিশালী হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্যের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা থাকে, এককেন্দ্রিক সরকারের কোন সাংবিধানিক প্রতিপক্ষ থাকে না। সুতরাং তার পক্ষে একক ইচ্ছায় সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং একচ্ছত্র প্রভাব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

৩। **আইন প্রণয়নের প্রাধান্য ঃ** কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র দেশের জন্য আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের দায়িত্ব গ্রহণ করে। প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ সরকারই একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। সমগ্র দেশ একই ধরণের আইন এবং প্রশাসনিক নীতির অন্তর্ভূক্ত হয়।

৪। **আইন সভার প্রাধান্য ঃ** এককেন্দ্রিক সরকারে সংবিধানের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এককেন্দ্রিক সরকারের চরিত্র অনুসারে সংবিধান নমনীয় বা সুপরিবর্তনীয় হয়। কেন্দ্রীয় আইনসভা সহজেই সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতে সংবিধান সংশোধন করতে পারে।

৫। **অর্থনৈতিক বিকাশ ঃ** অর্থনৈতিক দিক থেকেও অনেকের কাছে এককেন্দ্রিক সরকার কাম্য। আধুনিক রাষ্ট্রে সরকারকে জনকল্যাণ এবং দ্রুত অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং রূপায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়।

৬। **ব্যয়ভার হ্রাস ঃ** অনেকে মনে করেন যে, এককেন্দ্রিক সরকারে কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্যের বিভক্তি না থাকায় প্রশাসন পরিচালনার ব্যয়ভার হ্রাস পায় বিধায় জনসাধারণকেও কর এবং অন্যান্য খাতে অনেক কম ব্যয় ভার বহন করতে হয়। এজন্য এই সরকার জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

৭। **ছোট রাষ্ট্রে উপযোগী ঃ** ক্ষুদ্র আয়তন বিশিষ্ট রাষ্ট্রের জন্য এককেন্দ্রিক সরকার বিশেষ উপযোগী। যেসব দেশে জাতিগত এবং ভাষা ও ঐতিহ্যগত বৈচিত্র্য কম সেসব দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করা এককেন্দ্রিক সরকারের জন্য সুবিধাজনক। যার ফলে সেসব দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

পরিশেষে বলা যায় যে, অর্থনৈতিক সংকট এবং অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দমনে এককেন্দ্রিক সরকার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। আবার শান্তির সময়েও এর অন্যথা হয় না। এসব কারণে সারা পৃথিবীর অনেক দেশে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা চালু আছে।

এককেন্দ্রিক সরকারের সমস্যাবলী

এককেন্দ্রিক সরকারের কতকগুলো গুণ থাকলেও এটি ত্রুটিমুক্ত কোন ব্যবস্থা নয়। নিম্নে এককেন্দ্রিক সরকারের সমস্যাগুলি আলোচনা করা হল ঃ

১। **কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য ঃ** এককেন্দ্রিক সরকারে সর্বত্রই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে আঞ্চলিক সরকারগুলোর অস্তিত্ব অর্থহীন হয়ে পড়ে। এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার শক্তিশালী হওয়াও কঠিন।

২। **প্রশাসনিক জটিলতা ঃ** একই ধরনের আইন ও ব্যবস্থার মাধ্যমে সকল অঞ্চলের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব নয়। বিভিন্ন অঞ্চলের সমস্যার সমাধানের জন্য বিভিন্ন ধরণের ব্যবস্থা প্রয়োজন। আঞ্চলিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন বৈচিত্র্যপূর্ণ পদ্ধতি ও ব্যবস্থা। এককেন্দ্রিক সরকারে তা সম্ভব নয়।

৩। **আমলা নির্ভর সরকার ঃ** এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় একটি কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে দেশের প্রতিটি অঞ্চলের এবং সকল সমস্যার খুঁটিনাটি বিবেচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। রাজনীতিবিদগণ দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য আমলাদের সাহায্য ও পরামর্শের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন।

৪। **কেন্দ্রবিরোধী মনোভাব ঃ** এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সর্বদা সকল রাজ্য বা অঞ্চলের দাবির প্রতি নজর দেওয়া ও সুবিচার করা সম্ভব হয় না। এর ফলে আঞ্চলিকতা, প্রাদেশিকতা, বিচ্ছিন্নতাকামী প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

৫। **দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ ঃ** এককেন্দ্রিক সরকারে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এই ব্যবস্থাতে কেন্দ্রীয় সরকারের আইন ও শাসন বিভাগের বোঝা ক্রমশই ভারী হয়ে ওঠে। একটি মাত্র সরকারকে সকল দায়িত্ব পালন করতে হয় বিধায় বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় না।

৬। **ভৌগোলিক ও মানসিক দূরত্ব ঃ** বৃহদায়তন রাষ্ট্রে এককেন্দ্রিক সরকার সফল হতে পারে না। এককেন্দ্রিক ব্যবস্থাতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের মধ্যে ভৌগোলিক এবং মানসিক দূরত্ব বেশি থাকে।

৭। **অর্থনৈতিক বৈষম্য ঃ** অর্থনৈতিক দিক থেকেও এককেন্দ্রিক সরকারকে সমর্থন করা যায় না। যে-কোন রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক সমস্যা ও সম্ভাবনা থাকে। এককেন্দ্রিক সরকারে যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার এককভাবে সামগ্রিক জাতীয় অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ করে সেজন্য প্রতিটি অঞ্চলের দিকে দৃষ্টি দেয়া সম্ভব হয় না।

৮। **স্থানীয় উদ্যোগ ও উৎসাহ দমন ঃ** জে ডব্লিউ গার্নারের মতে, এককেন্দ্রিক সরকার স্থানীয় উদ্যোগ ও উৎসাহ দমন করে। সরকার রাজনৈতিক বিষয়ে স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চারের পরিবর্তে নিরুৎসাহ সৃষ্টি করে।

৯। **নমনীয় সরকার ঃ** এককেন্দ্রিক সরকার নমনীয় বলেই শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে সংবিধান সংশোধন করতে পারে। এর ফলে একদিকে দলীয় স্বেচ্ছাচার এবং অন্যদিকে শাসনতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্রের পথ প্রশস্ত হয়। অতিনমনীয়তা সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করতে পারে।

১০। **আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ঃ** যে-সব দেশে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাধীনতার দাবি অত্যন্ত প্রবল সেসব দেশে এককেন্দ্রিক সরকার সাফল্য অর্জন করতে পারে না।

পরিশেষে বলা যায় যে, ক্ষুদ্র আয়তন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক সরকারের সফল হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। বৃহদায়তন রাষ্ট্রে এককেন্দ্রিক সরকারের পক্ষে সকল অঞ্চলে সমান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং সমান সেবাদান সমস্যা হতে পারে। নানাবিধ জাতি, ভাষা কিংবা সংস্কৃতিতে বিভক্ত রাষ্ট্রের জন্য এককেন্দ্রিক ব্যবস্থাকে সহায়ক হিসেবে বিবেচনা করা হয় না।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	এককেন্দ্রিক সরকারের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করুন।

সার-সংক্ষেপ

এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে। এ ধরনের সরকারে কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকারের হাতে ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়া হয় না। আয়তনে ছোট রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে এক কেন্দ্রিক সরকার বেশ কার্যকর হলেও, বিশাল আয়তন ও নানা জাতি, নানা সংস্কৃতি সম্পন্ন রাষ্ট্রগুলেতে এককেন্দ্রিক সরকার খুব বেশি সফল হয় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। এককেন্দ্রিক সরকারের ক্ষমতার উৎস কি?

(ক) আইনসভা (খ) মন্ত্রিসভা

(গ) সংবিধান (ঘ) জনগণ

২। সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান অনুসারে সরকার ব্যবস্থা কয় প্রকার?

(ক) ২ (খ) ৪

(গ) ৬ (ঘ) ৮

৩। এককেন্দ্রিক সরকার কোন ধরনের রাষ্ট্রের জন্য উপযোগী?

(ক) আয়তনে বড় (খ) আয়তনে ছোট

(গ) উন্নত রাষ্ট্র (ঘ) উন্নয়নশীল রাষ্ট্র

পাঠ-৭.১১ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণাবলি ও সমস্যা (Merits and Demerits of Federal Government)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সমস্যাগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	জাতীয় ঐক্য, প্রশাসনিক নৈপুণ্য, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, ভৌগোলিক ঐক্য, জাতীয় সরকার, জাতীয় সংহতি।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণাবলি

বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশেই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা চালু আছে। নিম্নে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণাবলি আলোচনা করা হল ঃ

১। **সমন্বয় সাধন ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার জাতীয় ঐক্য এবং স্বার্থের সঙ্গে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের সমন্বয় সাধন করে। এ ধরণের সরকারে একাধারে কেন্দ্রকে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষমতা অর্পণ এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি পূরণ করা সম্ভব। এ সরকারের সামগ্রিকভাবে জাতীয় অগ্রগতি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

২। **আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণে সাহায্য করে। বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের সরকারসমূহ ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৩। **কেন্দ্রীয় আমলাতান্ত্রিকতা প্রতিরোধ ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় আমলাতান্ত্রিকতা প্রতিরোধে সহায়ক। অঙ্গরাজ্যের সরকারসমূহ আঞ্চলিক সমস্যা, দাবি এবং প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত থাকে। অঞ্চলের জনসাধারণের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রশাসকদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সুশাসনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে বিধায় আমলাদের প্রাধান্য হ্রাস পায়।

৪। **রাজনৈতিক সচেতনতা ঃ** বিশাল দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থাই জনসাধারণকে রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। সরকারের সঙ্গে তাদের নৈকট্য যত বেশি হয়, সরকার এবং সরকারের কার্যাবলিতে অংশগ্রহণের জন্যও তাদের উৎসাহ তত বৃদ্ধি পায়। রাজনৈতিক সক্রিয়তাই জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করে।

৫। **প্রশাসনিক নৈপুণ্য ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রশাসনিক নৈপুণ্য বৃদ্ধির সহায়ক। অঙ্গরাজ্যের সরকারসমূহ আঞ্চলিক এবং কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ভূক্ত সমস্যার সঙ্গে জড়িত থাকে। অঙ্গরাজ্যের সরকার নিজ-নিজ ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে ব্যাপৃত থাকে বিধায় তাদের নৈপুণ্য ও পারদর্শিতা বৃদ্ধি পায়।

৬। **কেন্দ্রীয় স্বৈরাচার প্রতিরোধ ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় স্বৈরাচার প্রতিরোধে সহায়ক। সংবিধান কর্তৃক অঙ্গরাজ্যগুলোকে ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকার স্বীয় বিবেচনা ও সুবিধা অনুযায়ী রাজ্যের ক্ষমতা সংকোচন অথবা নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে না।

৭। **আইন প্রণয়নে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন ও প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। এ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুফলগুলো সমগ্র দেশে প্রয়োগ করা যায়। এর ফলে জাতীয় স্বার্থরক্ষায় কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্যের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ গড়ে ওঠে। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশ থাকে না।

৮। **স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় অঙ্গরাজ্যসমূহ বেশির ভাগ স্থানীয় সমস্যাসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা ছাড়া মীমাংসা করে থাকে। এর ফলে তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হয়। এ অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্ব পরবর্তীতে জাতীয় সমস্যা সমাধানে সহায়ক হয়।

৯। **রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের বিপুলসংখ্যক নাগরিক শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় এবং রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করে থাকে। রাজ্যসমূহের জন্য পৃথক আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ ও বিচারালয় থাকার ফলে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার তুলনায় অধিক সংখ্যক লোক শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে এবং শাসন ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার অতুলনীয়। তাই এ সরকার ব্যবস্থা বহু জাতি, বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতির দেশগুলোতে জাতীয় সংহতির সহায়ক।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সমস্যাবলী

বর্তমান সময়ে সারা পৃথিবীতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কোন সমস্যা নেই। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ নানা দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সমস্যাগুলো আলোচনা করেছেন। নিচে তার বর্ণনা করা হল ঃ

১। **দুর্বল সরকার ব্যবস্থা ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবসায় কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে সংবিধান কর্তৃক ক্ষমতা বণ্টিত হওয়ার ফলে এককেন্দ্রিক সরকার অপেক্ষা এ সরকার দুর্বল হতে বাধ্য। এ ব্যবস্থায় কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের অথবা রাজ্যের সঙ্গে বিরোধের ফলে সরকার দুর্বল হয়ে পড়ে।

২। **সমন্বয় সাধন দুঃসাধ্য ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে ক্ষমতা, নীতি ও কর্মসূচির সমন্বয় সাধন দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন রাজ্য সরকার বিভিন্ন কর্মসূচির ভিত্তিতে প্রশাসন পরিচালনা করলে, বিশেষভাবে কেন্দ্র এবং রাজ্যের নীতির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হলে প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হয়।

৩। **অগ্রগতি ব্যাহত ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা জাতির অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হওয়ার ফলে পরিবর্তিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে দ্রুত লয়ে চলার পথে বাধার সৃষ্টি হয়।

৪। **জাতীয় স্বার্থ অবহেলিত ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে বসবাসকারী জনগণ সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যের প্রতি তাদের প্রাথমিক আনুগত্য প্রকাশ করে। স্বাভাবিকভাবেই আঞ্চলিক স্বার্থের সঙ্গে জনগণের প্রাথমিক স্বার্থ জড়িত থাকে বলেই অনেক ক্ষেত্রেই তারা বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন থাকে না এবং অনেক ক্ষেত্রেই জাতীয় স্বার্থের তুলনায় আঞ্চলিক স্বার্থের প্রতিই বেশি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে।

৫। **বিরোধ সৃষ্টি ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক কারণে বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে।

৬। **জটিল সংবিধান ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার সংকটকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের অনুকূল নয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান জটিল। প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে সংশোধন করে জরুরি সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তাছাড়া অঙ্গরাজ্যের সরকারের বিরোধীতার ফলে বহু ক্ষেত্রে জরুরি ভিত্তিতে সমস্যার সমাধানে বাধা সৃষ্টি হয়।

৭। **ব্যয়-বহুল ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পরিচালনা ব্যয়-বহুল। কেন্দ্র এবং রাজ্যে সরকার পরিচালনার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়। বহু ক্ষেত্রে অর্থের অপচয়ও ঘটে।

৮। **ক্ষমতা বণ্টনের সমস্যা ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের প্রাধান্যের স্বীকৃতি এবং অঙ্গরাজ্যসমূহের কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল করে তোলার নীতি অঙ্গরাজ্যের স্বাতন্ত্র্য ব্যাহত করে। অর্থনৈতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীলতা যত বৃদ্ধি পায় অঙ্গরাজ্যের স্বাতন্ত্র্যও তত বেশি ব্যাহত হয়। ভারতের মত রাষ্ট্রে এ ধরনের সমস্যা মাঝে মাঝে দেখা দেয়।

৯। **সংকীর্ণতাবাদী আন্দোলন ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কেন্দ্রের নীতি সিদ্ধান্তের ফলে যদি দীর্ঘকাল ধরে কোন অঞ্চলের দাবি উপেক্ষিত হয়, তাহলে এর বিরুদ্ধে সংকীর্ণতাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে। বস্তুত: যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার সব সময়ে জাতীয় ঐক্যের অনুকূল হয় না।

১০। **দীর্ঘসূত্রিতা ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক প্রশাসন থাকায় কখনো কখনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসময় ব্যয় হয়। বিশেষ পরিস্থিতিতে এককেন্দ্রিক সরকার যেভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে সেটা

কঠিন হয়ে পড়ে। আবার কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা ও মতামত পেতে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে আঞ্চলিক সরকারের কাজের গুরুত্বই অনেক সময় কমে যায়।

১১। **বিচ্ছিন্নতাবাদের আশঙ্কা ঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে সকল প্রদেশে সমানভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয় না। অনেক প্রদেশ আবার রাজনৈতিক যোগাযোগের কারণে পিঁছিয়ে পড়ে। তখন তারা অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এ ধরনের অবস্থা অনেক দিন চলতে থাকলে এবং কোন একটি প্রদেশের অনেক মানুষের মধ্যে কেন্দ্রের ব্যাপারে বঞ্চনার বোধ দেখা দিলে বিচ্ছিন্নতাবাদ জন্ম নেয়ার আশঙ্কা দানা বেধে উঠে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সংবিধান বর্ণিত পন্থাতে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলো নিজ-নিজ কর্মপন্থা নির্ধারণ করলে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থেকে গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ সুফল অর্জন করা সম্ভব।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	আপনি কি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার সমর্থন করেন? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দিন?

সার-সংক্ষেপ

যে সরকার ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা সাংবিধানিক উপায়ে বন্টন করা হয় এবং উভয় সরকার স্ব-স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে ও স্বাতন্ত্র্য ক্ষমতা চর্চা করে তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা আয়তনে বৃহৎ রাষ্ট্রের জন্য বেশি উপযোগী। কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সবসময় সমন্বয় ও যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হয়। যার জন্য রাষ্ট্রের অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কেন্দ্রিয় স্বৈরাচার প্রতিরোধ করে কোন ব্যবস্থা?

ক) যুক্তরাষ্ট্রীয় খ) এককেন্দ্রিক
গ) মন্ত্রিপরিষদ শাসিত ঘ) স্বৈরাচারী

২। বিচ্ছিন্নতাবাদের আশঙ্কা থাকে কোন ব্যবস্থাতে?

ক) এককেন্দ্রিক খ) যুক্তরাষ্ট্রীয়
গ) রাষ্ট্রপতি শাসিত ঘ) স্বৈরাচারী

৩। প্রশাসনের কোন সমস্যাটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাতে দেখা যায়?

ক) অতিদ্রুততা খ) দীর্ঘসূত্রিতা
গ) সংকীর্ণতা ঘ) তথ্যহীনতা

পাঠ-৭.১২ এককেন্দ্রিক সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার (Unitary and Federal Government)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- এককেন্দ্রিক সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	স্থানীয় সরকার, অঙ্গরাজ্য, আইনের বৈধতা, আইন সভার প্রাধান্য।

এককেন্দ্রিক সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের পার্থক্য

এককেন্দ্রিক সরকার হল এমন সরকার, যেখানে শাসন বিষয়ক ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এককেন্দ্রিক সরকারের যথার্থ দৃষ্টান্ত। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় সংবিধান কর্তৃক কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্যের সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত হয়। এককেন্দ্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে কয়েকটি মৌলিক পার্থক্য আছে। নিম্নে পার্থক্যসমূহ আলোচনা করা হল ঃ

১। **রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ঃ** এককেন্দ্রিক সরকারে রাষ্ট্র পরিচালনার একচ্ছত্র ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত। তার ইচ্ছা এবং সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ভিন্ন ধরণের। কেন্দ্রীয় সরকার এবং অঙ্গরাজ্যের সরকারসমূহ নিয়ে এই সরকার গঠিত হয়। এই সরকারে অঙ্গরাজ্যের সরকারসমূহের অস্তিত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়। তারা সংবিধান কর্তৃক গঠিত। এ কারণেই তাদের স্বতন্ত্র সাংবিধানিক মর্যাদা আছে। সংবিধানের কাছেই তারা দায়বদ্ধ থাকে।

২। **সংবিধানের ধরণ ঃ** এককেন্দ্রিক সংবিধান ব্রিটেনের মতো অলিখিত এবং ফ্রান্সের মতো লিখিত হতে পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান অবশ্যই লিখিত হবে। এর প্রধান কারণ হল এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সকল ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। সেই কারণে সংবিধান অলিখিত হলেও কোন অসুবিধা নেই। পক্ষান্তরে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্য উভয়েরই সরকার থাকে। সংবিধানে প্রত্যেকের নিজ নিজ এখতিয়ার এবং ক্ষমতা নির্দিষ্ট না থাকলে উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

৩। **সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে ঃ** এককেন্দ্রিক সরকার নিজের প্রয়োজন অনুসারে অপেক্ষাকৃত সহজে আইন ও ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি সুপরিবর্তনীয় হলে এবং ঐ ক্ষমতা এককভাবে কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত থাকলে, কেন্দ্রীয় সরকার অঙ্গরাজ্যের ক্ষমতা সংকুচিত করতে পারে। এ কারণেই যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি দুস্পরিবর্তনীয় হতে বাধ্য।

৪। **আনুগত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে ঃ** এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় নাগরিকদের কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে থাকে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় নাগরিকদের বাস্তবে নিজ-নিজ রাজ্যের সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আনুগত্য ধারণ করতে হয়।

৫। **আইন সভার প্রাধান্যের ক্ষেত্রে ঃ** এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় আইনসভার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ এখানে আইনসভার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এখানে আইন সভা কর্তৃক প্রণীত আইনকে অমান্য করা কঠিন। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থাতে আইন সভার পরিবর্তে সংবিধানের সার্বভৌমত্ব অধিক গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

৬। **নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ঃ** এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় অঙ্গরাজ্যের সরকারসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। পক্ষান্তরে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় অঙ্গরাজ্যের সরকারসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত থেকে সরকার পরিচালনা করে।

৭। **স্থানীয় সরকার ঃ** এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রশাসনের সুবিধার জন্য বিভিন্ন স্থানীয় সরকার গঠন হতে পারে। তবে এসব স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন এবং তার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় আঞ্চলিক বা স্থানীয় সরকারসমূহ সংবিধান দ্বারা গঠিত এবং ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা দু'টি পৃথক ও বিপরীতধর্মী সরকার ব্যবস্থা। কোন রাষ্ট্র কোন ধরনের সরকার গ্রহণ করবে তা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের আয়তন, নাগরিকের মনোভাব সর্বোপরি বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মূল পার্থক্যগুলো চিহ্নিত করুন।

সার-সংক্ষেপ

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গেলে তাদের মধ্যে স্বাভাবিক কতকগুলো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এককেন্দ্রিক সরকারে যেখানে ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত থাকে, সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে ক্ষমতা সংবিধান অনুসারে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোন দেশে এককেন্দ্রিক সরকার বিদ্যমান?
(ক) যুক্তরাষ্ট্র (খ) যুক্তরাজ্য
(গ) ভারত (ঘ) কানাডা

২। সংবিধান সংশোধন কোন ব্যবস্থাতে সহজ?
(ক) এক কেন্দ্রিক খ) যুক্তরাষ্ট্রীয়
(গ) নির্দলীয় (ঘ) কোনটি নয়

৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় মূল ক্ষমতা কার হাতে?
(ক) কেন্দ্র (খ) রাজ্য
(গ) আমলাতন্ত্র (ঘ) সেনাবাহিনী

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুপদী নির্বাচনী প্রশ্ন

১। সরকারের প্রধান লক্ষ্য–
(i) কঠোর অনুশাসন (ii) জনকল্যাণ নিশ্চিত (iii) বিদ্রোহ দমন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii
(গ) i ও ii (ঘ) ii ও iii

২। কীভাবে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা যায়?
(i) ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে;
(ii) ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে;

(iii) সচেতনতার মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ

সৈকত বাংলাদেশের নাগরিক। বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। তথাপি এদেশে এখনও দুর্নীতি বিদ্যমান। অনিয়মও রয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু উক্ত সমস্যাসমূহ থেকে মুক্তির জন্য সৈকত মনে করে এদেশে আইনের শাসন, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।

৩। অনুচ্ছেদের আলোকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বর্তমানে যে জিনিসটি খুবই দরকার–

(ক) স্বৈরতন্ত্র (খ) রাজতন্ত্র

(গ) সুনাগরিক (ঘ) বুদ্ধিজীবী

৪। দুর্নীতি ও অনিয়ম বাংলাদেশের কোন ধরনের সমস্যা?

(ক) স্থানীয় সমস্যা (খ) আঞ্চলিক সমস্যা

(গ) জাতীয় সমস্যা (ঘ) আন্তর্জাতিক সমস্যা

নিচের ছকটি দেখে ৫নং প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ

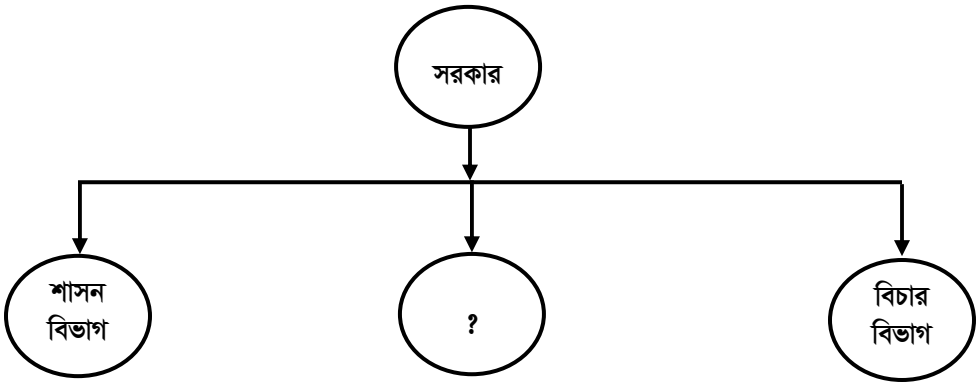

৫। (?) চিহ্নিত স্থানটি কোনটি নির্দেশ করে?

(ক) আইন বিভাগ (খ) সামরিক বাহিনী

(গ) আমলাতন্ত্র (ঘ) এলিট

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬নং ও ৭নং প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ

'ক' নামক রাষ্ট্রে আইনের অনুশাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন বিদ্যমান। অপরদিকে 'খ' নামক রাষ্ট্রের জনগণ এসব প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। তবে দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের পর সেখানে গণতন্ত্র চালু হলেও আইনসভার নিকট শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা নেই।

৬। 'ক' নামক রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান?

(ক) এককেন্দ্রিক (খ) যুক্তরাষ্ট্রীয়

(গ) সংসদীয় (ঘ) রাষ্ট্রপতি শাসিত

৭। উদ্দীপকে বর্ণিত 'খ' নামক রাষ্ট্রে সরকারের যে বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে তা হল–

(ক) আইন (খ) শাসন

(গ) বিচার (ঘ) নির্বাচক মন্ডলী

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিচের ছকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন ঃ

A সরকার ব্যবস্থা		B সরকার ব্যবস্থা	
#	প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীগণ তাঁদের কাজে জন্য সংসদের নিকট দায়ী।	#	প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীগণ তাঁদের কাজে জন্য সংসদের নিকট দায়ী নয়।
#	শাসন বিভাগের সদস্যগণ আইন সভারও সদস্য হয়ে থাকেন।	#	শাসন, আইন ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ করা হয়ে থাকে।
#	জনমত দ্বারা পরিচালিত হয়।	#	জাতীয় সংকটকালে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

(ক) গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিন।

(খ) গণতন্ত্রের শ্রেণিবিভাগ করুন।

(গ) A দ্বারা কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) আপনি কি মনে করেন B অপেক্ষাকৃত উত্তম সরকার ব্যবস্থা? বিশ্লেষণ করুন।

২। নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

মি. রাহুল 'ক' রাষ্ট্রের একজন মন্ত্রী। তাঁর কার্যক্রমের জন্য তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে ও তাঁর মন্ত্রিসভা দেশের জাতীয় সংসদের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। তাদের দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তাদের দেশের আইন অনুযায়ী অনাস্থা দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারলে তাদের পদত্যাগ করতে হয়।

(ক) আব্রাহাম লিঙ্কন প্রদত্ত গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিন।

(খ) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা কীরূপ?

(গ) মি. রাহুল এর দেশের সরকার ব্যবস্থা কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা? ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) "উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকার ব্যবস্থাই উত্তম সরকার ব্যবস্থা।"– বিশ্লেষণ করুন।

৩। নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

রায়হান 'ক' রাষ্ট্রের এবং রাহাত 'খ' রাষ্ট্রের নাগরিক। রায়হানের রাষ্ট্রের সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। উক্ত রাষ্ট্রের সরকার প্রধান ও মন্ত্রিসভা আইনসভার নিকট জবাবদিহি করেন না। অন্যদিকে রাহাতের রাষ্ট্রের সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন এবং সরকার প্রধান ও মন্ত্রিসভা আইনসভার নিকট জবাবদিহি করে থাকে। যার ফলে রাষ্ট্রের উন্নয়ন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়।

(ক) সরকার কী?

(খ) এককেন্দ্রিক সরকার বলতে কি বুঝেন?

(গ) এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে পার্থক্য নিরূপন করুন।

(ঘ) রায়হান ও রাহাতের দেশের দুটি সরকার ব্যবস্থার মধ্যে বাংলাদেশের জন্য আপনি কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থাকে উত্তম বলে মনে করবেন। ব্যাখ্যা দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১ ঃ ১। গ ২। খ ৩। গ ৪। ক ৫। ঘ ৬। ক ৭। খ ৮। গ ১০। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২ ঃ ১। ক ২। খ ৩। খ ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৩ ঃ ১। খ ২। ঘ ৩। ঘ ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৪ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ক ৪। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৫ ঃ ১। খ ২। ক ৩। খ ৪। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৬ ঃ ১। খ ২। ঘ ৩। ক ৪। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৭ ঃ ১। ক ২। খ ৩। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৮ ঃ ১। গ ২। খ ৩। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৯ ঃ ১। খ ২। ক ৩। গ ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১০ ঃ ১। গ ২। ক ৩। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১১ ঃ ১। ক ২। খ ৩। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১২ ঃ ১। খ ২। ক ৩। ক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন ঃ ১। খ ২। গ ৩। গ ৪। গ ৫। ক ৬। গ ৭। খ